ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ১১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ পৌষ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ১৯ মুহররম, ১৪৩২ হিজরি | ১৫ ফাতাহ্, ১৩৯০ হি. শা. | ১৫ ডিসেম্বর, ২০১১ ঈসাব্দ

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.

Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon Since 1985
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

ইসলাম : মধ্যপন্থা শিক্ষা দেয়

স্মরণ রাখতে হবে, খোদা তাআলার তৌহিদ (একত্ব) সম্বন্ধে সঠিক বিশ্বাস রাখা এবং এতে কম-বেশী না করাই হল সঠিক বিচার যা মানুষ তার প্রকৃত মালিকের সম্বন্ধে পালন করে থাকে। এই সকল বিষয় নৈতিক শিক্ষার অন্তর্গত যা কুরআন শরীফের শিক্ষায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে মূল সূত্র হল, খোদা তাআলা সমগ্র নৈতিক গুণকে ঐ অবস্থায় নৈতিক গুণ নামে আখ্যায়িত করেছেন, যখন তা বাস্তব ও ন্যায্য সীমা অপেক্ষা কম বা অধিক না হয়। স্পষ্ট কথা, প্রকৃত সাধুতা এটাই, যা দুই সীমানার মধ্যখানে থাকে। অর্থাৎ, আধিক্য ও ন্যূনতা এবং কম-বেশীর সীমানা অতিক্রম করার মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। যে অভ্যাস মধ্যপন্থার দিকে আকৃষ্ট করে এবং মধ্যপন্থা কায়েম করে, সেইটিই উন্নত নৈতিকতা সৃষ্টি করে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি জানা একটি মধ্যপন্থা। দৃষ্টান্ত স্থলে, কৃষক সময়ের পূর্বে বা পরে তার বীজ বপন করলে, সে উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা পরিত্যাগ করে। পুণ্য, সত্য এবং প্রজ্ঞা সব রয়েছে মধ্যপন্থায় এবং মধ্যপন্থা রয়েছে পরিস্থিতি নির্ধারণেও। অথবা এমনটা বলা যায় যে, সত্য সর্বদা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মিথ্যার মধ্যভাগে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সঠিক সুযোগ অনুসরণে মানুষ সর্বদাই মধ্যপন্থায় থাকে। খোদাকে চিনবার ব্যাপারে মধ্যপন্থার পরিচয় এই যে, খোদার গুণ বর্ণনায় নেতিবাচক গুণাবলীর দিকে অধিক ঝুঁকবে না এবং খোদাকে জড় দেহধারী জিনিষের অনুরূপ বলে নির্ধারণ করবে না। কুরআন শরীফ স্রষ্টার গুণাবলী বর্ণনায় এই পন্থাই অবলম্বন করেছে। যেমন, এটা বলে খোদা দেখেন, শোনেন, জানেন, বলেন, বাক্যলাপ করেন, তেমনি তা অন্যদিকে সৃষ্টির সাদৃশ্য হতে রক্ষা করার জন্য বলে :

লাইসা কামিছলিহী শাইউন (সূর শুরা : ১২)
ফালা তাযরিবু লিল্লাহিল আমসালা (সূরা নাহল : ৮৫)

অর্থাৎ, "খোদার সত্তা ও গুণে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর সংগে সৃষ্টির উপমা দিবে না" (৪২ : ১২, ১৬ : ৭৫)। সুতরাং, খোদার সত্তাকে উপমিত বা গুণাতীত এই উভয়ের মাঝামাঝি রাখাই মধ্যপন্থা। বস্তুত: ইসলামের শিক্ষা সবই মধ্যপন্থার শিক্ষা।

[ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

১৫ ডিসেম্বর ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
১৮ নভেম্বর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
হযরত আলী (রা.) মূল: ফজল আহমদ, ইউকে ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ	১৩
উকিলে আ'লার দপ্তর থেকে	১৬
প্রেস রিলিজ **পোপ বেনিডিক্ট এর কাছে বিশ্বমুসলিম নেতার শান্তির বার্তা প্রেরণ**	২০
দাজ্জাল ও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) প্রসঙ্গ সরফরাজ এম, এ , সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২২
প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতায় হাজারো নিদর্শন -মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু	২৪
মসজিদে হাশেম-এ কিছুক্ষণ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৬
বাংলার কিংবদন্তি **জার্মানীর প্রথম মিশনারী** **খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী**	২৯
আমাদের ভেবে দেখা দরকার সংকলকঃ খালিদ আহমদ সিরাজী	৩২
কবিতা– **ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় যুগল শহীদ স্মরণে** এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম	৩৩
সংবাদ	৩৪
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿۹۲﴾

৯২। তারা বললো, 'আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং নিশ্চয় আমরাই দোষী ছিলাম।'

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩। সে বললো, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ[১৪০৭] নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর তিনি দয়ালুদের মাঝে সব চেয়ে বেশী দয়ালু।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۹۴﴾

৯৪। তোমরা আমার এ জামাটি সাথে নিয়ে যাও এবং আমার পিতার সামানে এটি রেখে দিও (তাহলে) তিনি সব বুঝতে পারবেন। আর (পরবর্তীতে) তোমরা আমার কাছে পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসো'।

১৪০৭। হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদেরকে অনিশ্চয়তায় ঝুলিয়ে না রেখে তাদের প্রতি ব্যবহার কিরূপ হবে সে সম্বন্ধে তাদেরকে ভীতি ও আশঙ্কামুক্ত করে বললেন, তাঁর ক্ষমা শর্তহীন এবং অকপট। এরূপ বিরাট অন্ত:করণের অতুলনীয় মহৎ ও দয়াপূর্ণ ক্ষমা যা ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের প্রতি দেখিয়েছিলেন তার তুলনা কেবল নবী করীম (সা.) এর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। ইউসুফ (আ.) এর মত আমাদের নবী করীম (সা.) মদীনায় দেশান্তরী হওয়ার পর সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং বেশ কয়েক বছর পর দশ হাজার সাহাবার নেতারূপে যখন তাঁর মাতৃভূমির শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছিলেন এবং যখন মক্কায় কাফেররা তার পদতলে পতিত হয়েছিল তখন নবী করীম (সা.) মক্কাবাসীদিগকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা তাঁর নিকট কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে। উত্তরে মক্কাবাসীরা বলেছিল, 'হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছিলেন'। তৎক্ষণাত রাসূল করীম (সা.) ঘোষণা করলেন, 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।' পূর্বেকার রক্তপিপাসু জাত-শত্রু মক্কার কুরায়শরা যারা নবী করীম (সা.) এর জীবন নাশের এবং ইসলাম ধর্মের বিনাশ সাধনের জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেনি, আজ তাদেরই প্রতি মহানবীর (সা.) এইরূপ ক্ষমা-সুন্দর উন্নত চরিত্র ও আদর্শ ব্যবহার মানবাজতির ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অনুপম হয়ে আছে।

হাদীস শরীফ

মু'মিনরা একে অপরের ভাই

কুরআন :

"নিশ্চয় মু'মিনরা একে অপরের ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন করো, আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়" (সুরাতুল হুজুরাত : ১১)।

হাদীস :

আন আবিহুরায়রাতা আন্না রসূলাল্লাহে ক্বালা তুফতাহু আবওয়াবুল জান্নাতে ইয়াওমাল ইসনায়নে ওয়া ইয়াওমাল খামীসে ফাইউগফারু লিকুল্লি আবদিন লা ইউশরিক বিল্লাহি শাইয়ান ইল্লা রাযুলান কানাত বায়নাহু ওয়া বায়না আখীহে শাহনাউ ফাইউকালু আনযিরু হাযায়নে হাত্তা ইয়াসতালিহা আনযিরু হাযায়নে হাত্তা ইয়াসতালিহা। (মুসলিম)

"নিশ্চয় মু'মিনরা একে অপরের ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন করো, আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়"

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশ্‌তের দরজা খুলে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করে না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যে লোকের সাথে তার মুসলমান ভাইয়ের শত্রুতা রয়েছে তাদের সম্পর্কে বলা হয় এদের অবকাশ দাও যেন নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে। এদের অবকাশ দাও যেন নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে (মুসলিম)

ব্যাখ্যা :

আমাদের জীবন এক চলমান বাস্তবতা। এ বাস্তবতার সামনা-সামনি হতে হলে এমন এক পরিপূর্ণ বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে যা মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার ও সৌহার্দ্রে ভরে দিতে পারে। পবিত্র কুরআন আমাদের অন্তরকে পরিষ্কার ও সৌহার্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে যা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কাউকে অবজ্ঞা করা বা কাউকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা এমন ব্যাধি যা মানবতাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়।

তাই কুরআন বলে, তোমরা হিংসা আত্মগরিমা ও অহংকার হতে মুক্ত হও।

হুযূর (সা.) আমাদের এমনই একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানে হুযূর (সা.) জানাচ্ছেন আল্লাহ্‌র রহমতের কথা। শত্রুতার জন্মদাতা, হিংসা-বিদ্বেষ আত্মগরিমা ও অহংকার। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) জানাচ্ছেন, আল্লাহ্ এ বিষয়টিকে অপসন্দ করেন। তিনি শাস্তি দিতে চান তথাপি তিনি তাঁর দয়া ও মমতার কারণে বান্দাকে সুযোগ দেন যেন মানুষ নিজের সংশোধন করে নিতে পারে। এ বিষয়ে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাঁর পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ্'-তে বিশদ আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন শত্রুতায় আক্রান্ত না হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক উম্মতে পরিণত হতে পারি, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

অহংকারের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকলে হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর, যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং যার উপর তা নিপতিত হয়, তার ইহকাল ও পরকালকে সমূলে বিনষ্ট করে। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে থাকনে। তোমরা কি তাঁকে প্রতারণা করতে পার? সুতরাং তোমরা পরিষ্কার, সরল, পবিত্র এবং নির্মল হয়ে যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অহংকারের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে তা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে নষ্ট করে দিবে। যদি তোমাদের হৃদয়ের কোন অংশে অহঙ্কার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তবে তোমরা আদৌ তাঁর গ্রহণযোগ্য হবে না।

দেখ, তোমরা মাত্র কয়েকটি কথা শিখে যেন আত্মপ্রতারণা না কর যে, তোমরা তোমাদের কর্তব্য সাধন করেছ। আল্লাহ্ তাআলা চাহেন যেন তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি তোমাদের নিকট হতে এক মৃত্যু চাহেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে এক নতুন জীবন দান করবেন। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সাথে বিবাদ মীমাংসা করতে প্রস্তুত নয়, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে যাবে। তোমরা নিজ নিজ রিপুর বশবর্তীতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর এবং সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও, যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হতে পার। তোমরা রিপূর স্থূলতা বর্জন কর। কারণ, যে দ্বার দিয়ে তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, সে দ্বার দিয়ে কোন স্থূলরিপু ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না।

কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র মুখনিঃসৃত বাণী যা আমার দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, মানতে প্রস্তুত নয়! তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি, যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। তেমন ব্যক্তির সাথে আমার কোন সংস্রব নেই। খোদা তাআলার অভিশাপ হতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থেকো। কারণ তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। অহংকারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। যারা কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত সংসারাসক্ত এবং সংসার-সম্ভোগে নিমগ্ন তারা কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তা থেকে দূরে।

প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাকে অগ্নি হতে মুক্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য কাঁদে, সে অবশ্যই হাসিবে। যে ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে সংসারের মায়া মোহকে বর্জন করে, সে নিশ্চয় তাঁকে লাভ করবে। তোমরা আন্তরিকতাপূর্ণ সরলতা এবং উৎসাহের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করতে অগ্রসর হও, তাহলে তিনিও তোমাদের বন্ধু হবেন। তোমরা নিজ অধীন ব্যক্তিদের প্রতি, তোমাদের স্ত্রী-পরিজন এবং গরীব ভাইদের প্রতি দয়া কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যথার্থই তাঁর হয়ে যাও যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান। জগৎ বহু বিপদের স্থান। অতএব, তোমরা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর দিকে ধাবমান হও যেন তিনি এই বিপদরাশি হতে তোমাদেরকে দূরে রাখেন। জগতে কোন বিপদ দেখা দেয় না, যে পর্যন্ত আকাশে তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হয় এবং কোন বিপদ জগৎ হতে দূর হয় না, যে পর্যন্ত আকাশ হতে তাঁর দয়া বর্ষণ না হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এটাই যে, তোমরা শাখাকে অবলম্বন না করে মূলকে ধর। তোমাদের জন্য ঔষধ এবং উপকরণের ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ পরিশেষে অবশ্য তা-ই ঘটবে, যা তিনি ইচ্ছা করেন। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরের শক্তি রাখে তবে তদ্রুপ নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চ, সন্দেহ নেই।

(কিশ্‌তিয়ে নূহ্ পুস্তকের ২৩-২৫ পৃষ্ঠা থেকে)

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৮ নভেম্বর ২০১১-এর (১৮ নবুয়ত, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ آمين

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

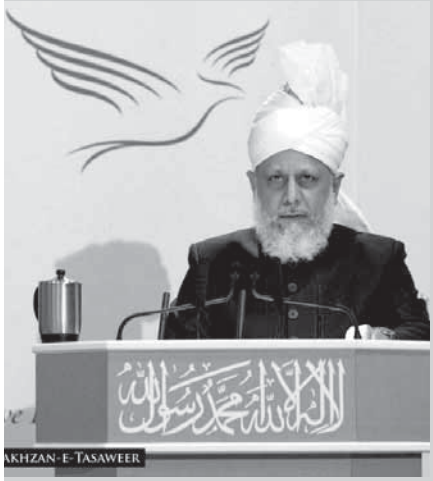

গত খুতবায় আমি হাদীসের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম, আহযাবের যুদ্ধে এমনও একদিন এসেছিল যখন মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের শত্রুদের উপর্যুপরি আক্রমনের ফলে পাঁচ বেলার নামায জমা করে পড়তে হয়েছিল। এ বিষয়ে আমাদের আরবী ডেস্কের নঈম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি আমাকে পাঠিয়েছেন যা উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের বর্তমানে আর কোন বিতর্কের অবকাশ থাকে না। তিনি (আ.) এ যুগের ইমাম, তিনি রেওয়ায়েত বা ঘটনা সম্পর্কে বলছেন, আমি স্বয়ং স্বপ্নে বা দিব্য-দর্শনে মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি অথবা তিনি (মসীহ্ মওউদ) স্বয়ং এর সত্যায়ন করেছেন তাই এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছি, হাদীসের কোন কোন গ্রন্থে তা উল্লিখিত আছে। কিন্তু মূল ঘটনা এ রকম নয় আর সকল হাদীসগ্রন্থ এ বিষয়ে একমতও নয়।

তাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নয় বরং চার বেলার নামায একত্রে পড়া সম্পর্কিত রেওয়ায়েত রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত হলো, আসর ও মাগরীবের নামায একত্রে পড়েছেন বা খুব সংকীর্ণ সময়ে তা পড়া হয়েতছে। এ বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির খাতিরে আরো কয়েকটি হাদীস উত্থাপন করছি। অনেকের জানার আগ্রহও থাকে। চার বেলার নামায একত্রে পড়ার রেওয়ায়েত বা ঘটনা তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এ রকম, 'হযরত আবু ওবায়দাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, খন্দকের (আহযাবের যুদ্ধে) যুদ্ধে একদিন মুশরিকরা বা প্রতিমাপূজারীরা মহানবী (সা.)-কে চার ওয়াক্ত নামায পড়া থেকে বিরত রেখেছিল; এমনকি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় রাতের একাংশ কেটে গেছে। এরপর মহানবী (সা.) হযরত বেলালকে আযান দিতে বললেন, তিনি আযান দিলেন।

এরপর একামত দেয়া হলো আর মহানবী (সা.) আসরের নামায পড়ালেন, পুনরায় তকবীর দেয়া হলে মাগরীবের নামায পড়ালেন আর পরবর্তী একামত হলে ইশার নামায পড়ালেন'। যেভাবে আমি বলেছি, এ হাদীসটি সুনান তিরমিযী গ্রন্থের নামায অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বায়হাকীও এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।

২০০৪ সালে সৌদি আরবের একটি প্রকাশনা সংস্থা মাকতাবাতুর রুশদ থেকে তা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে হযরত আলী (রা.)-এর যে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে আর তা এরকম, হযরত আলী (রা.) বলছেন, 'খন্দকের দিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা ওদের গৃহ এবং

ওদের কবরগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দিন। ওরা আমাদেরকে (সালাতুল উস্‌তা) অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায থেকে বঞ্চিত রেখেছে- এমন কি সূর্য অস্তমিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের এ ব্যাখ্যাই করা হয় যে, সেটি আসরের নামায ছিল। যাহোক, আমি বলতে চেয়েছিলাম, নামায নষ্ট হওয়ায় হুযূর (সা.)-এর এত বেশি কষ্ট হয়েছিল যে, তিনি শত্রুদের অভিশম্পাত করেছিলেন। অতএব এখানে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায় অর্থাৎ এক বেলার নামায নষ্ট হওয়াটাও তাঁর কাছে অসহ্য ছিল যার ফলে শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি এত শক্ত কথা বলেছেন।

বুখারী শরীফের তফসীর (ব্যাখ্যা) ফাতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে হাজর আসক্বালানী লিখেন, ইবনে আরবী- এ বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর সেই নামায যা থেকে (তাঁকে) বিরত রাখা হয়েছিল সেটি কেবল এক বেলার নামায ছিল অর্থাৎ আসরের নামায। সে নামাযটি হয়ত সে সময় পড়া হয়েছিল যখন মাগরীব নামাযের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল বা সূর্য প্রায় অস্ত হতে যাচ্ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে বিস্তারিত যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এখন পড়ে শুনাচ্ছি। একজন খ্রিস্টান পাদ্রী ফাতেহ মসীহ্ সাহেব মহানবী (সা.) সম্পর্কে অনেক আপত্তি করেছে আর অত্যন্ত নোংরা একটি পত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছে। তিনি (আ.) নূরুল কুরআন দ্বিতীয় খন্ডে সেটির উত্তর দিয়েছেন। এছাড়া তাতে বিভিন্ন ধরনের আপত্তিরও খন্ডন করেছেন। তাতে একটি আপত্তি এরকম ছিল যে, একদিন মহানবী (সা.) চার বেলার নামায পড়েন নি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ফাতেহ্ মসীহ্‌কে সম্বোধন করে তাতে যে উত্তর দিয়েছেন তা হচ্ছে,

'পরিখা খননের সময় চার বেলার নামায 'কাযা' করার বিষয়ে আপনার অর্থাৎ ফাতেহ্ মসীহ্ এই শয়তানী সন্দেহ সম্পর্কে 'প্রথম কথা হলো, আপনাদের জ্ঞানের বহর নিয়ে চিন্তা করুন। হে নির্বোধ! 'কাযা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কাযা' নামায আদায় করাকে বলা হয়, নামায ছেড়ে দেয়ার নাম কখনো 'কাযা' হয় না। যদি কারো নামায বাদ পড়ে বা রয়ে যায় তা হলে সেটির নাম হচ্ছে, 'ফওত' (নষ্ট হওয়া) হওয়া। এ জন্য আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারী নির্বোধদের পাঁচ হাজার রূপী (পুরস্কারের) বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। এমন নির্বোধও ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করে যারা এখন পর্যন্ত 'কাযা' শব্দের অর্থও জানে না'। সাধারণতঃ এ বিষয়ে আমাদের সমাজেও অনেকের সঠিক জ্ঞান নেই। তারা মনে করে, কাযার অর্থ হলো নামায বাদ দেয়া অথচ কাযার অর্থ হলো নামায নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পর পড়া হয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, 'শব্দকে যথাস্থানে ব্যবহার করতে জানে না এমন নির্বোধ সূক্ষ্ম বিষয়ের কি করে সমালোচনা লিখতে পারে আর গভীর বিষয়াদী সম্পর্কে কীভাবে আপত্তি করতে পারে? অবশিষ্ট থাকল পরিখা খননের সময় চার বেলার নামায একত্রে বা জমা করে পড়ার বিষয়টি! এমন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ সন্দেহের উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ধর্মে কাঠিন্য নেই,' অর্থাৎ কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা বা কঠোরতার স্থান নেই। 'অর্থাৎ এমন কাঠিন্য নেই যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়। এ জন্য তিনি প্রয়োজন ও বিপদাপদের সময় নামায 'জমা' করার এবং 'কসর' পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসে চার বেলার নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ নেই।

অর্থাৎ চার ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ নেই বরং সহীহ্ বুখারীর তফসীর 'ফাত্‌হুল বারী'তে লিখা আছে,'কেবল এক বেলার নামায অর্থাৎ আসরের নামাযের জন্য সময় খুবই অল্প ছিল আর রীতি-বহির্ভূত ভাবে সে সময় নামায পড়া হয়েছিল।

আপনি যদি এখন আমার সামনে থাকতেন তবে আমরা আপনাকে বসিয়ে একটু জিজ্ঞেস করতাম, চার বেলার নামায ছুটে যাওয়ার অর্থাৎ না পড়া সম্পর্কিত রেওয়ায়েতটির কোন নির্ভরযোগ্যতা আছে কি? নামায বাদ গিয়েছিল অর্থাৎ আদায় করা হয়নি? শরিয়ত মোতাবেক চার বেলার নামায একত্রে পড়া যেতে পারে অর্থাৎ যোহর-আসর আর মাগরীব-ইশা। তবে, একটি দুর্বল হাদীসে আছে, যোহর ও আসর এবং মাগরীব ও ইশা একত্রে পড়া হয়েছিল। কিন্তু অন্য সহীহ্ হাদীস একে প্রত্যাখ্যান করে। কেবল এটিই প্রমাণ হয়, আসরের নামায সঙ্কীর্ণ সময়ে পড়া হয়েছিল'।

অতএব, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই সিদ্ধান্তের পর, তাঁর মোহরাঙ্কনের পর এই চার বেলার নামায একত্রে পড়া সক্রান্ত যে হাদীস যা আছে তা ভুল। শুধু এক বেলার নামাযই বিলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, এর জন্যও মহানবী (সা.) এতোটা মর্মযাতনায় ভুগেন যে, তিনি বিরোধীদের ভৎর্সনা করেন এবং বলেন, এরা আমাদের নামায নষ্ট করে দিয়েছে।

যাহোক, যে হাদীস গত খুতবায় আমি পড়েছি এর ফলে কিছুটা লাভও হয়েছে। আমাদের বই পুস্তকে যেখানে এর উল্লেখ আছে তাঁরও সংশোধন হয়ে যাবে। সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব-এর 'সীরাতুন নবী (সা.)' পুস্তকে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষ্য অনুসারে বিষয়টি সঠিকভাবেই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি উইলিয়াম মুইর এর কথা লিখেছেন, যিনি চার ওয়াক্ত নামায জমা করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মিয়া সাহেব, অর্থাৎ মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সেখানে তার (মুইর এর) ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং আসরের নামায সক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সিদ্ধান্ত যা বুখারী শরীফের হাদীস সহ অন্যান্য হাদীস থেকে পাওয়া যায় সেই অনুসারে এর ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ কেবল আসরের নামাযই অসময়ে পড়া হয়েছিল।

কিন্তু অন্যত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ২৩ মে, ১৯৮৬ সালে তাঁর এক খুতবায় পাঁচ বেলার নামায জমা পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল বা বুখারীর বরাতে তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাহের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে খুতবার যে সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বুখারী কিতাবুল্ মাগাযীর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। অথচ সেখানে বুখারীর মাগাযী বা যুদ্ধ অধ্যায়ে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়নি। আমি নিজে সবসময় মূল হাদীস দেখার চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু আমি যেহেতু এই হাদীসের রেফারেন্স এখানে দেখেছিলাম অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)'র এই খুতবায়; এজন্যই আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখিনি তাই ভুল হয়েছে। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, এই ভুলের কারণে লাভও হয়েছে।

প্রথমতঃ জামাতের বই-পুস্তক যেখানেই ভুলভ্রান্তি রয়েছে তার সংশোধন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ আমি নিজেও অনুধাবন করলাম, কোন সময় কোন উদ্ধৃতি ব্যবহার করলে তা ভালোভাবে যাচাই করার চেষ্টা করা উচিত। তৃতীয়তঃ আমাদের প্রতিষ্ঠানের স্মরণ রাখা উচিত, যখন কোন প্রবন্ধ বা খুতবা প্রকাশ

করা হয় প্রথমে দেখতে হবে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন কথা থাকলে তা অবশ্যই দেখা উচিৎ। অবশ্য, যুগ খলীফার কোন কথাকে অন্য কেউ সংশোধন করবে না বরং খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছেই তা জিজ্ঞাসা করা উচিৎ। আবার পূর্ববর্তী খলীফার কোন কথা যদি বর্ণিত হয়ে থাকে আর সেসব কথা যদি কোন রেওয়ায়েত, হাদীস বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকে পাওয়া যায় তাহলে সে অনুযায়ী সংশোধন করা প্রয়োজন। কিন্তু খলীফায়ে ওয়াক্তকে জিজ্ঞাসার পর তা সংশোধন হবে।

অতএব তাহের ফাউন্ডেশনকে ১৯৮৬ সালের এই খুতবার সংশোধন করা উচিত ছিল যেখানে পাঁচ বেলার নামায একত্রে পড়ার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে সংশোধন করুন। আমাকে লিখে পাঠাবেন এরপর তাদের দিক নির্দেশনা দেয়া হবে, তা কীভাবে করতে হবে এবং আগামীতেও একই নীতি অনুসৃত হবে। পূর্বের খলীফার বর্ণনায় যদি কোন ভুল উদ্ধৃতি স্থান পায় তাহলে পরবর্তী খলীফারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে তা ঠিক করাবেন। কিন্তু রেওয়ায়েত সন্দেহযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যেখানে ভিন্ন হাদীস রয়েছে আর সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা আছে; যাচাই-বাছাই না করে তা ছাপিয়ে দেয়া ভ্রান্ত রীতি। এটি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

যাহোক এই ব্যাখ্যা করা আমি আবশ্যকীয় মনে করেছি, যেভাবে আমি বলেছি এরফলে সবাই লাভবান হয়েছে। বাস্তব বিষয়টি সামনে এসে গেছে, সংশোধনী সামনে এসেছে আর কিছু প্রাসঙ্গিক কথাও এসে গেছে আর প্রশাসনিক দিক নির্দেশনাও দেয়া হয়ে গেছে।

এরপরে আমি সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী কয়েকজন বুযুর্গের স্মৃতিচারণের বিষয়ে আসতে চাই যাঁদের মাঝে আমি সর্বপ্রথম উল্লেখ করবো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কন্যা সাহেবযাদী আমাতুন্ নাসীর বেগম সাহেবার কথা, গত সপ্তাহে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি আমার খালাও ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাশাআল্লাহ্ সচল ও কর্মক্ষম ছিলেন। তিন চার দিন পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তী হয়েছিলেন। ডাক্তার নূরী সাহেব তাঁর চিকিৎসা করেছেন। একটি নালীর এনজিও প্লাস্টিও করা হয়েছে, দুই তিন দিন পর দ্বিতীয়বার রোগের আক্রমন হয় এরপর কিছুটা আরোগ্য লাভ করছিলেন তবে মনে হয় হঠাৎ করে হার্ট এটাক হয়েছে যা প্রাণহারী প্রমাণিত হয়। হাসপাতালেই চিকিৎসারত অবস্থায়ই আপন প্রভুর কাছে চলে গেছেন।

মরহুমা সর্বদা হাসি-খুশী থাকতেন এবং উত্তম স্বভাবের অধিকারিনী ছিলেন এবং যতটুকু সম্ভব অপরের খোঁজ-খবর রাখতেন। আর্থিক সাহায্যও করতেন আবার অন্যের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যারা তাঁকে চিনেন বা জানেন তাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে যেসব সমবেদনার পত্র আসছে তাতে মনে হয় প্রায় সবাই এই কথা লিখেছেন যে, তাঁর মত নিঃস্বার্থ, অন্যের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল মানুষ আমরা খুব কমই দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই মরহুমা খালার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাঁর প্রিয়দের মাঝে তাঁকে স্থান দিন।

তিনি ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে হযরত সৈয়দা সারাহ্ বেগম সাহেবার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি হরযত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন। তাঁর মাতা যখন ইন্তেকাল করেন তখন সাহেবযাদী আমাতুন্ নাসীর বেগম সাহেবার বয়স ছিল মাত্র সাড়ে তিন বছর। তাঁর শৈশবের আবেগ-অনুভূতির চিত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর এক প্রবন্ধে অঙ্কন করেছেন। এটি এমন চিত্র যা পড়ে মানুষ আবেগাপ্লুত না হয়ে পারে না। আমি নিজের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখি; এটি যখন আমি নির্জনে পড়ছিলাম তখন আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হচ্ছিল। যাহোক, এর কিছু অংশ তুলে ধরব যা তাঁর শৈশবের উন্নত আচার আচরণের সাথে সম্পর্ক রাখে। এতেও সবার জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে।

যেভাবে আমি বলেছি, তাঁর বয়স মাত্র সাড়ে তিন বছর ছিলো যখন তাঁর মাতা পরলোকগমন করেন। কিন্তু এই বাল্যকালেও একটি উন্নত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তিনি। আর সেই বিস্তারিত প্রবন্ধ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লিখেছেন এর কিছু অংশ বা দু' একটি কথা আমি উল্লেখ করবো। সেই প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে মানুষের অবস্থা অদ্ভুত হয়ে যায় আর বর্ণনা যদি হয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র তাহলেতো কথাই নেই। তারপরও যেভাবে আমি বলেছি, একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ উপস্থাপন করবো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর জীবন চরিত সম্পর্কে বিভিন্ন জন আমাকে যা লিখেছেন তা আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। বরং আমার আম্মা বলতেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তোমার খালাকে তাঁর আম্মার মৃত্যুর পর হযরত উম্মে নাসের (রা.)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন আর এর উল্লেখ হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) করেছেন। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সে সময় আমার আম্মাকে এ দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, তাঁর দেখাশোনা করো। আমার আম্মা তাঁর থেকে প্রায় ১৯ বছরের বড় ছিলেন আর অনেকটা মা মেয়ের সম্পর্ক ছিলো।

আমার মা'য়ের যখন বিয়ে হয়েছে তখন আমার খালার বয়স সাত আট বছর বা খুব বেশী হলে নয় বছর হবে। যখন আমার মায়ের বিদায় হচ্ছিল তখন খালা এই বলে জিদ করছিলেন যে, 'বুবুজান ছাড়া আমি থাকতে পারবো না আমিও তাঁর সাথে যাবো'। তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে বুঝান আর এর ফলশ্রুতিতে তিনি শান্ত হন। তিনি শান্ত হয়েছেন আর সে ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করে দেন। আশৈশব যে ধৈর্য ও গাম্ভীর্যতা দেখিয়ে এসেছেন তাঁরই বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আর অত্যন্ত উদাসী জীবনযাপন আরম্ভ করেন। যাহোক পরবর্তীতে তিনি হযরত আম্মাজান উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-এর কাছে থাকেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর সন্তানদের জন্য রাবোয়ায় যেসব ঘর বানিয়েছেন, সেখানে খালা এবং আমার মায়ের ঘর পাশাপাশি ছিল– মাঝখানে শুধু দেয়াল ছিল। নকশা পরিবর্তন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বর্ধিত নির্মাণ কাজ হয়নি। এক পর্যায়ে গিয়ে কিছু নতুন নির্মাণ কাজও হয় কিন্তু যতদিন ঘরের নকশা পরিবর্তন হয়নি আমাদের এবং তাঁর ঘরের মাঝে একটি দরজাও ছিল, পরস্পরের ঘরে যাতায়াত ছিল এবং অত্যন্ত অকৃত্রিম পরিবেশ ছিল। আমি আমার খালাকে সর্বদা হাসি-খুশি এবং হাস্যবদনে সাক্ষাত করতে এবং নিজ গৃহে ছোট বড় সকলকে স্বাগত জানাতে দেখেছি।

তাঁর মাঝে আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য ছিল অতি উন্নত। ঘরে আগত ধনী-গরিব, ছোট-বড় এক কথায় সবার আতিথেয়তা করতেন। তাঁর স্বামী,আমার খালু মুকাররম পীর মঈনুদ্দীন সাহেব ছিলেন পীর আকবর আলী সাহেবের ছেলে। তাদের পরিবারের অধিকাংশই অ-আহমদী ছিল। খালা তাদের সাথেও আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধন রক্ষা করেছেন।

মুকাররম পীর মঈনুদ্দীন সাহেবের ভাতিজী লিখেছেন, আমাদের দাদাপক্ষের আত্মীয়রা অ-আহমদী হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে চাচীর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ ও সম্মানের। তাদের সবাই চাচীকে গভীর মূল্যায়ন করেন এবং ভালবাসার সাথে স্মরণ করেন। আল্লাহ্ করুন ভালবাসার এই ব্যবহার তাদেরকে আহমদীয়তের নিকটে আনার কারণ হোক। তাঁর দোয়াও যেন তাদেরকে কাছে আনার কারণ হয় এবং তারা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চিনার সৌভাগ্য পায়।

ভাগ্নে-ভাগ্নী, ভাতিজা-ভাতিজীদের সাথে তাঁর অকৃত্রিম এবং ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সবাই তাঁর কাছে ব্যক্তিগত কথা বলতো আর আন্তরিকতার কারণে তাঁর উপদেশও শুনতো আর তাঁর উপদেশ শুনে মন খারাপ করতো না। তাঁর বকাঝকাও হতো স্নেহের আবরণমন্ডিত এবং এবং হাস্যবদনে। তিনি নসীহত করতে হলে সর্বদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), হযরত আম্মাজান ও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ঘটনাবলীর আলোকে সতর্ক করতেন ও উপদেশ দিতেন। তাঁর এক ভাগ্নী আমাকে বলেছে, একবার তাদের (দু'জন জ্ঞাতিবোন ছিল) পক্ষ থেকে অনিচ্ছাকৃত এমন একটি ভুল হয়ে যায় যার মাঝে কৌতুকের উপকরণও ছিল।

বড় কাউকে এটি শোনানোর জন্য তারা ব্যাকুল ছিল। কিন্তু যেদিকেই চোখ যায় এমন লোকদের দেখে, যাদের শোনালে বকা শুনতে হতে পারে। অবশেষে তাঁর কাছে এলো। তিনি অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে তাদের কথা শুনলেন আর এতে এমন কৌতুক ছিল যার ফলে হাসিও পেল। তাদেরকে স্নেহের সাথে বকাও দিয়েছেন এবং বলেছেন, এমন পরিস্থিতিতে ইসলামী শিক্ষা হলো এই। আহমদীয়াত ও ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরার কোন সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতেন না। যখনই বুঝানোর কোন সুযোগ পেতেন বুঝাতেন এভাবেই তিনি চেষ্টা করতেন আর তাঁর সব কথা একে ঘিরেই হতো। সেই সাথে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিবারের মেয়েদের বুঝাতেন, তোমাদের নিজস্ব একটি বিশেষ পদমর্যাদা রয়েছে, তা রক্ষা করে চলতে হবে। আমি যখনই তাঁর ঘরে যেতাম খুব আদর-আপ্যায়ন করতেন, সেভাবে যেমনটি বড়দের করা হয়। খিলাফতের পর তাঁর ভালবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক আরো প্রগাঢ় হয়ে যায় আর এর সাথে আনুগত্য ও সম্মানের মাত্রাও যুক্ত হয়।

দোয়ার জন্য নিয়মিত চিঠি দিতেন, খবর পাঠাতেন মোটকথা খিলাফতের সাথে তাঁর অসাধারণ সম্পর্ক ছিল। এখানে দু'বার জলসায় যোগ দিয়েছেন, কোন একজন আহমদীর হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি যে সম্মান থাকা উচিত সে শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁর মাঝে পরম পর্যায়ের ছিল। এতটা ছিল যে কখনও কখনও তাঁর ব্যবহারে আমি নিজেই লজ্জা পেতাম। তিনি যখনই আসতেন একথাই বলতেন, প্রত্যেক বছর আসতে ইচ্ছে হয় কিন্তু বয়সের কারণে চিন্তায় পড়ি। কখনও কখনও প্রোগ্রাম করেও তা বাস্তবায়িত হয় না।

আমি যেভাবে বলেছি, হযরত আম্মাজান উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-এর কাছেই থাকতেন, আমার মায়ের বিয়ের পর বেশিরভাগ সময় তিনি হযরত আম্মাজানের কাছেই ছিলেন। হযরত আম্মাজানের অনেক ঘটনা তাঁর জানা ছিল। একবার যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণকালে সদর লাজনার ব্যবস্থাপনায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইউ.কে.-র জন্য কিছু ঘটনা রেকর্ডও করিয়েছিলেন। হযরত আম্মাজানের সেই সমস্ত ঘটনাবলী যদি ছাপা না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর বরাতে তা ছাপানো উচিত।

একবার যখন হযরত আম্মাজান খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর দু'জন স্ত্রীকে পালাক্রমে তাঁর ঘরে রাতের ডিউটিতে নিযুক্ত করেন। তখন আম্মাজান বললেন, আমার জন্য এ মেয়েটিই যথেষ্ট। তার সেবায় আমি অভ্যস্ত কাজেই অন্য কাউকে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। হযরত আম্মাজানও তাঁর সাথে অত্যন্ত ভালবাসা ও স্নেহসুলভ ব্যবহার করতেন। যখন তাঁর বিয়ে হয়ে গেল তখন হযরত আম্মাজান অত্যন্ত উদাস হয়ে যান। কিছুদিন পর যখন তিনি দেখা করতে আসেন তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁকে হাত ধরে হযরত আম্মাজানের কাছে নিয়ে যান আর বলেন, এই নিন আপনার মেয়ে দেখা করতে এসেছে। মোটকথা, তাঁর সাথে আম্মাজানের অত্যন্ত স্নেহের ব্যবহার ছিল।

খিলাফত সম্পর্কে কথা বলছিলাম। খিলাফতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে এটিও বলে দিচ্ছি, খিলাফতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা এত গভীর ছিল যে, কোন নিকটাত্মীয়েরও পরওয়া করতেন না। এ কারণে তাঁকে কয়েকবার বিভিন্ন সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়েছে।

কিন্তু খিলাফতের জন্য তিনি সর্বদা ঢাল স্বরূপ ছিলেন। তাঁর ঘরে লালিত-পালিত যুবক বরং বেশ বয়স্ক একব্যক্তি লিখেছেন, মোহতরমা (বিবি জানের) মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি কেননা আমরা একজন অত্যন্ত পুণ্যবতী, দোয়াকারীনি এবং বুযূর্গ ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি। এরপর তিনি লিখেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত নেক, দোয়াকারীনি, গরীব ও অভাবীদের সাহায্যকারীনি এবং অত্যন্ত খোদাভীরু মহিলা। তিনি সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন এবং যুগ খলীফার নির্দেশাবলী পালনের সুযোগ সন্ধান করতেন।

তিনি মহল্লাতে লাজনার (মহিলা সংগঠনের কাজও করতেন)। একজন বলেন, প্রায় সময় লাজনার সদস্যাদের কাছে লাজনার 'মিসবাহ' পত্রিকার চাঁদা সংগ্রহের জন্য আমাকেও পাঠাতেন। যদি কোন বাড়ীতে বিলম্ব হয়ে যেতো বা চাঁদা না আসতো তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে দিতেন। আর সবসময় চাঁদা জমা দেয়ার ব্যাপারে খুবই সোচ্চার থাকতেন।

এরপর লিখেন, কখনও কখনও বাজারে জিনিষ-পত্র কেনার জন্য পাঠাতেন। কোন সময় পয়সা অপর্যাপ্ত হলে আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে খরচ করতাম; তিনি বলতেন, বিলম্ব না করে আমার কাছ থেকে তাৎক্ষণিক ভাবে টাকা নিয়ে নিবে; আমি কারো কাছে ঋণী থাকতে চাই না। তেমনিভাবে এ বর্ণনাকারী আরো লিখেন, এরপর যে মাসে বিয়ের কার্ড বা নিমন্ত্রণ পত্র বেশি আসতো আমাকে বলতেন,

(বর্ণনাকারীর নাম মুমতাজ) এসব কার্ডের একটি তালিকা তৈরি কর আর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তিনি বলেন, যে দিন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিবারের পুরনো কোন সেবিকার বিয়ে হতো সেদিন তিনি অবশ্যই যেতেন। অথবা বলতেন, এটি একটি গরীব মেয়ের বিয়ে আমাকে অবশ্যই মনে করিয়ে দিবে। কখনও কখনও দিনে তিন বারও বলতেন, আমি এই গরীব মেয়ের বিয়েতে অবশ্যই যাবো, প্রস্তুত থেকো। এছাড়া তাঁর আরো অনেক উপদেশ রয়েছে। তাঁর জামাতা, সৈয়দ কাশেম আহমদ লিখেছেন, যুগ খলীফার প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক– খালা যে মহল্লায় লাজনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সে মহল্লার মহিলাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এ সম্পর্কে কোন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন ছিলো না বরং একটি সহজাত প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিলেন।

যে দিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন সকালে বার বার বলছিলেন, হুযূর (আই.)-এর খিদমতে আমার জন্য দোয়ার আবেদন পাঠাও। মনে হচ্ছিল, মৃত্যুর সময় সম্পর্কে পূর্বেই তাঁর ধারণা জন্মেছিল, কেননা তাঁর এক দৌহিত্রকে তিনি নিজের মৃত এক ভাবীর সম্পর্কে বলছিলেন, তিনি এসেছেন। মেয়েদের ডেকে আদর করলেন এবং বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দিও। অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারিনী ছিলেন। মা-শাশুড়ী ও স্ত্রী হিসেবে তাঁর দৃষ্টান্ত ছিলো অনেক উন্নত। তাঁর মরহুম স্বামীর রুচী বা পছন্দ-অপছন্দের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখতেন আর কখনো কোন অভিযোগের সুযোগ দেননি। এই প্রবীণ পুণ্যবানদের দৃষ্টান্ত এ জন্যই আমি উপস্থাপন করেছি যেন আমাদের নবদম্পতি, এমন পরিবার বা স্বামী-স্ত্রী যাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয় তারা যাতে; বিশেষভাবে মেয়েদের ভাবা উচিত, মহিলাদেরও এদিকে গভীর দৃষ্টি রাখা উচিৎ যে, নিজেদের ঘরের সুরক্ষা করা তাদেরই দায়িত্ব।

আবার লিখেন, তিনি স্বামীর পরিপূর্ণ আনুগত্য করেছেন আর নিজের মেয়েদেরও এ শিক্ষাই দিয়েছেন, স্বামীদের প্রতি যত্নবান থাকবে। কখনো স্বামীর সাথে তাঁকে তর্ক করতে দেখিনি। কাউকে উপদেশ প্রদান করতে হলে বেশির ভাগই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আর হযরত আম্মাজানের বরাতে উপদেশ দিতেন। কোন সময় রাগ করলেও তা ক্ষণস্থায়ী হতো, আবার পূর্বের স্নেহসূলভ ব্যবহার অব্যাহত রাখতেন। আর মেয়েদেরকে অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের মেয়েদেরকে সবসময় উপদেশ দিতেন, স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের কারণে যেন কেউ হোঁচট না খায়। আল্লাহ্ করুন তাঁর এই দোয়া এবং এই উপদেশাবলী তাঁর মেয়ে এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের অন্যান্য মেয়েদেরও যেন কাজে লাগে।

তারপর লিখেন, চাকরানী বা সেবিকাদের সাথেও খুবই স্নেহসুলভ ব্যবহার করতেন। যেসব মেয়েরা ঘরে বড় হত বা প্রাপ্তবয়স্কা হতো তাদের জন্য ছোট বয়স থেকেই অলংকারাদী বানানো আরম্ভ করতেন। তাদের বিবাহের খরচ ইত্যাদিও বহন করেন। কখনো কখনো দেখা গেছে, কাজের বুয়া এবং তাদের মেয়েরা খুবই খারাপ আচরণ করছে। কেউ তখনই তাদের বিদায় করে দেয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলতেন, এখনো এদের বিয়ে দেয়া বাকী আছে। বিবাহের পর তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হতেন। অধিকাংশ সময় বলতেন, বধুকে বুঝাতে হলে (সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই উপদেশও অনেক মূল্যবান) ছেলেকে বুঝাও আর যদি জামাতাকে বুঝাতে হয় তাহলে মেয়েকে সদুপদেশ প্রদান করা উচিত।

অনুগ্রহ বা দয়াদাক্ষিণ্যের রীতি এমনভাবে অবলম্বন করতেন যেন অন্যরা বুঝতে না পারে। ইবাদত ও চাঁদার ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতার প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। নিজে চরম কষ্ট করে হলেও সে সকল দায়িত্ব পালন করতেন আর চেষ্টা করতেন যেন সে ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য প্রদর্শিত না হয়। ১৯৪৪ সালে যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পত্তি উৎসর্গ করার তাহরীক করেছিলেন তখন তিনি তাঁর সকল অলঙ্কার দিয়ে দেন। ১৩ বছর বয়সেই কাদিয়ানের দারুল মসীহ্তে ব্যবস্থাপিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কাদিয়ানের সেক্রেটারী নাসেরাতও ছিলেন। হিজরতের পরে রতনবাগ এবং রাবওয়ায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের সুযোগ হয়েছে আর কখনো কোনো পদের জন্য লালায়িতা ছিলেন নাা। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বও সামান্য কোন কাজের জন্য আহ্বান করা হলে তখনিই তা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। জ্ঞানগত, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ ও কুশলী নারী ছিলেন। তিনি একটি স্বাক্ষাতকারে বলেন, লাহোরের রতনবাগে হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের স্ত্রী, মামী হযরত সালেহা বেগম সাহেবা, রাতে ঘুরে বেড়াতেন এবং যাদের গায়ে দেয়ার মত কাপড় থাকতনা তাদেরকে তিনি কম্বল দিতেন।

এটিও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, ১৯৪৯ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং হযরত আম্মাজানের সাথে তাদের গাড়িতে রাবওয়াহ্ আসার সৌভাগ্য হয়। তিনি বলতেন, এটি আমার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। রাবওয়ার মসজিদে মোবারকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে 'ইটে' দোয়াকারীদের মাঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের মহিলাদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। যখন রাবওয়ায় প্রথম জনবসতি গড়ে ওঠে তখন সব বাড়িঘর ছিল কাঁচা। তিনি মহিলাদের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি উত্তর দারুস সদর হালকার লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দীর্ঘদিন সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

১৯৭৩ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাবওয়ার নায়েব সদর ছিলেন, সে সময় আমার মা ছিলেন লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাবওয়ার সদর। তাঁর সাথে তিনি কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ৮২ সালে দু'এক বছর লাজনা ইমাইল্লাহ্র সেক্রেটারী খিদমতে খালক এবং সেক্রেটারী যিয়াফতের দায়িত্বও পালন করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন দায়িত্বে তিনি জামাতের সেবা করেছেন। আর বিভিন্ন সময় তাঁকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বা যে দায়িত্বেই ছিলেন তা তিনি পরম বিনয়ের সাথে পালন করতেন। তাঁর এক মেয়ে আমকে লিখেছেন, অসুস্থাবস্থায় কেউ যদি আম্মুর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন আর সাক্ষাতের সুযোগ না পেয়ে চলে যেতেন তাহলে তিনি খুবই মর্মাহত হতেন।

আমাদেরকে বারবার বুঝাতেন, যদি কেউ সাক্ষাতের জন্য আসে তবে তাকে বাঁধা দেবে না। তাকে কখনো নিষেধ করো না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত থাকতো। প্রত্যেকেই তাঁর (রা.) সাথে সাক্ষাত করতে পারতেন। কাজেই আমার পক্ষ থেকে কীভাবে নিষেধ থাকতে

পারে? অতঃপর তাঁর অপর এক মেয়ে আমাকে লিখেন, আম্মু তাঁর সকল ভাই-বোনকে খুবই ভালবাসতেন। কেউ যদি ঠাট্টার ছলেও বলতো, অমুক আপনার সৎ বা আপন ভাই-বোন তবে তা তিনি তা সহ্য করতেন না। (হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন, অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল, কিন্তু সৎ বা আপনের প্রশ্ন উঠতো না)। জিজ্ঞেস করলে, তখনিই বলে দিতেন, সৎ বা আপনের প্রশ্ন ওঠানো ঠিক নয় কেননা, এ কথা আব্বাজান [অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)] খুবই অপছন্দ করতেন।

তিনি আরও লিখেন, আমাদের এক অ-আহমদী চাচা বলেন, ভাবী সবসময় গাম্ভীর্যের সাথে চলতেন। এরপর আমার মায়ের উল্লেখ করতঃ বলেন, খালা-আম্মুকে অনেক ভালবাসতেন এবং অধিকাংশ সময় বলতেন, আপা আমাকে লালন-পালন করেছেন। আব্বা কর্তৃক আমাকে বুবুজানের হাতে সোপর্দের পর বুবুজান তা শেষ পর্যন্ত পালন করেছেন। (আমার মাকে ছোট ভাই-বোনেরা বাজীজান বা বড় আপা বলে সম্বোধন করতেন)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর সুদীর্ঘ এক স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বপ্নে হযরত সাইয়্যেদাহ্ সারাহ্ বেগম সাহেবা এসেছেন। অন্যান্য কথার মাঝে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে বলেন, আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী বলেন, আমি স্বপ্নেই তাকে উত্তরে বললাম, তুমি আমাকে ছিরুর মত একটি মেয়ে দিয়েছ, আমি তোমার প্রতি কীভাবে রুষ্ট থাকতে পারি। (সাহেবযাদী আমাতুন্ নাসিরকে ঘরে আদর করে ছিরু বলে ডাকা হতো)।

তিনি সর্বদা এ ব্যাপারে সচেতন থাকতেন যে, তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কন্যা এবং তাঁর কারণে হুযূরের (রা.)-প্রতি কেউ যেন আঙ্গুল ওঠাতে না পারে। একটি ঘটনা যা তিনি কয়েকটি সভায়ও শুনিয়েছেন। একবার তিনি তাঁর ভাইয়ের ঘরে যাচ্ছিলেন, ঘরটি ছিল রাস্তার অপর পাড়ে আর তার ঘর রাস্তার এ পাড়ে। তিনি ভাবলেন, এদিকে আমার ঘর আর যেখানে যাবো অর্থাৎ ভাইয়ের ঘরও সামনেই তাই তিনি যথারীতি বোরকা বা নিকাব না পরে বোরকার নিচের অংশ মাথায় দিলেন এবং ঘোমটা দিয়ে হাটতে লাগলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যখন তিনি রাস্তায় এলেন তখন মাঝ পথে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে আসতে দেখলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) "কাসরে খিলাফত" থেকে এ দিকে আসছিল। তিনি বলেন, আমার কোন উপায় ছিল না, আমি এভাবেই ঘরে ফিরলাম। আমার ধারণা হল, হুযুর আমাকে দেখেন নি। পরের দিন নাস্তার সময় আমি যখন হুযুরের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, তুমি এক পা বাড়ালে লোকজন দশ পা বাড়াবে। কাজেই পর্দার ব্যাপারে যত্নবান হও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন তাঁর এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বংশের অন্যান্য ছেলে মেয়ে এবং জামাতের ছেলেমেয়েরা যেন সর্বদা পর্দার প্রতি যত্নবান থাকে।

উল্লেখিত প্রবন্ধে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, 'তিন সাড়ে তিন বছরের আমাতুন্ নাসির সর্বদা মায়ের সাথে থাকার কারণে মায়ের প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিল। তার ভাইয়ের বুঝানোর পর সে নিরব হয়ে গেল। মৃত্যু কাকে বলে সে তা জানত না। অন্যদের মুখে মৃত্যুর কথা শুনে সে মৃত্যু কি, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করত। না জানি তার ভাই তাকে কি বুঝিয়েছে, সে না কাঁদলো, না হট্টোগোল করলো বরং সে নিরব হয়ে গেল। সারাহ্ বেগমের মরদেহ খাটিয়ায় (সবাধার) রাখা হলে সেখানে উপস্থিত জামাতের মহিলারা কাঁদতে লাগলো। তখন সাহেবযাদী আমাতুন্ নাসির সাহেবা বলতে লাগলেন, আমার মা তো ঘুমিয়ে আছেন এরা কাঁদছে কেন? আমার মা যখন জেগে উঠবে তখন আমি তাকে বলবো, আপনি ঘুমোচ্ছিলেন আর মহিলারা আপনার মাথার কাছে বসে কাঁদছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো লিখেন, তাঁর মায়ের মৃত্যুর সময় তিনি (রা.) সফরে ছিলেন। আমার সফরে থাকাকালীন সময়েই তাকে সমাহিত করা হয়। আমি সফর থেকে ফিরে এসে আমাতুন্ নাসিরকে আদর করলাম তখন সে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লো কিন্তু সে কাঁদে নাই। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলাম কিন্তু তাঁরপরও সে কাঁদে নাই। আমি মনে করলাম, মৃত্যু কাকে বলে এটা সে জানে না। কিন্তু এটি আমার ভুল ধারণা ছিল। আমার এই মেয়ে আমাকে অন্য একটি শিক্ষা দিচ্ছিল। সারাহ্ বেগম দারুল আনওয়ারে অবস্থিত নব নির্মিত ঘরে মৃত্যুবরণ করেন। যখন আমি দারুল মসীহ্তে ফিরে আসলাম তখন দেখলাম তার পায়ে জুতা নাই। এক ব্যক্তিকে জুতা আনতে বলা হলো। সে জুতা দেখানোর জন্য নিয়ে এলো তখন আমি আমাতুন্ নাসিরকে বললাম, তুমি পছন্দ করে নাও। যে জুতাটি তোমার পছন্দ হয় সেটিই নাও। সে দু'পা এগিয়ে থেমে গেল এবং এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে এবং একবার তার বড় মা উম্মে নাসেরের দিকে তাকালো। অর্থাৎ সে বলতে চাচ্ছে, আপনি যে আমাকে আমার পছন্দনীয় জুতা নিতে বলছেন, আমার মা তো মরে গেছে, আমাকে কে জুতা নিয়ে দিবে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, এ দৃশ্য দেখে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। মনে হলো, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার চোখ থেকে অশ্রু বইতে শুরু করবে। আমি দ্রুততার সাথে মুখ ফিরিয়ে নেই এবং এ বলে আমি সেখান থেকে চলে যাই, তোমার মায়ের কাছে জুতা নিয়ে যাও। খলীফাতুল মসীহ্ সানী লিখেন, আমাদের ঘরে সব বাচ্চারা নিজ নিজ মাকে উম্মি এবং আমার বড় স্ত্রী'কে আম্মিজান বলে সম্বোধন করে থাকে। আমি যাওয়ার সময় পিছন ফিরে দেখলাম আমাতুন্ নাসির নিজ আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছে। সে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে জুতা উঠিয়ে তার মায়ের কাছে যাচ্ছিল। পরবর্তী ঘটনাক্রম সত্যায়ন করে যে, তার বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও সে তার মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটি খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর জন্য দোয়া করে লিখেন, 'আল্লাহ্ তা'লা এ অপ্রস্ফুটিত কলিকে (অর্থাৎ ছোট শিশুটিকে) ঝরে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন। তিনি এ ছোট্ট হৃদয়কে স্বীয় কৃপাবারি দ্বারা সিক্ত করুন এবং সুচিন্তা, মননশীলতা ও উত্তম আবেগানুভূতি দ্বারা ভূষিত করুন। এরফলে তিনি এক জগতের জন্য প্রাণদায়ী এবং সারা জগতের জন্য কল্যাণের কারণ সাব্যস্ত হোন। সর্বোত্তম দয়ালু খোদা যিনি হৃদয়সমূহ দেখে থাকেন, তিনি জানেন এ শিশুটি কীভাবে পরম ধৈর্যের সাথে নিজের আবেগ সম্বরণ করছে। (হে আল্লাহ্) জানিনা তোমার গুণাবলী সম্পর্কে সে জানে কি না, কিন্তু তোমার আদেশ পালনে সে তো

আমাদের চেয়ে বেশী বীরত্ব দেখিয়েছে। হে প্রার্থনা শ্রবণকারী খোদা! আমি তোমার সামনে আকুতি করছি, তার হৃদয়কে শোকের ঝঞ্ঝাবায়ু থেকে সুরক্ষিত রাখ। সে বাহ্যিকভাবে যে পরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে তুমি অভ্যন্তরিণভাবেও তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান কর। সে যেভাবে চরম সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে তুমি আক্ষরিক অর্থেও তাকে সে শক্তি দান কর। হে আমার প্রভু! তোমার প্রজ্ঞা তাকে এমন সময় তার মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, যখন সে সবেমাত্র মায়া-মমতা সম্পর্কে বুঝতে শিখছিল। হে প্রেম-ভালবাসার ঝরনা! তুমি তাকে তোমার ভালবাসার ক্রোড়ে আশ্রয় দাও এবং স্বীয় ভালবাসার বীজ তার হৃদয়ে বপন কর। হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমিই তাকে নিজের জন্য উৎসর্গীত করে নাও। নিজের সেবার জন্য মনোনীত কর। সে যেন তোমারই প্রেমে বিভোর ও তোমার দুয়ারেরই ভিখারী হয় এবং সে যেন তোমার দুয়ারেই ধর্না দেয়। তুমি তাকে পার্থিব কল্যাণও দান কর যেন সে লোকদের দৃষ্টিতে নিগৃহীত না হয়। সে সমুদয় সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক যেন এমন থাকে যেভাবে কোন ব্যক্তি বৃষ্টির সময় এক ঘর থেকে আরেক ঘরে দৌড়ে যায় (অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত থাকে)।'

মরহুমার যাপিত জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিলে এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, আল্লাহ তা'লার কৃপায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর এ দোয়া অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন, তাঁর সন্তানরা, তাঁর পরিবারের সবাই এবং জামাতের প্রতিটি সদস্য যেন এ দোয়ার অংশীদার হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর সব সন্তানদের জন্য আরোও একটি দোয়া করেছেন যা বর্ণনা করা আমি আবশ্যক মনে করি। আমি এটি পড়ে শুনাচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র জামাতকেও এর ভাগী করুন। আমরা ইনশাআল্লাহ্ বিজয়ী বেশে পরবর্তী যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমাদের পক্ষেও যদি এ দোয়া গৃহীত হয় তবেই আমরা সফল হতে পারব। দোয়াটি হলো,

'হে আমার প্রভু! আমার বাকী সন্তানদেরও তোমার নিকট সমর্পণ করছি। এরা যেন দুনিয়ার কীট না হয়। এরা যেন তোমার জান্নাতের পাখি সদৃশ হয়। এরা যেন ধর্মের স্তম্ভ এবং বায়তুল্লাহ্‌র সংরক্ষক হয়। তারা যেন আকাশের নক্ষত্র হয়ে অন্ধকারে পথহারাদের পথ প্রদর্শন করে এবং উজ্জ্বল সূর্য সদৃশ হয় যা অন্ধকার বিদীর্ণ করে: পরিশ্রম, উন্নতি ও কর্মময়তার পথ উন্মুক্ত করে। ঘুমন্তদের জাগ্রত করে এবং বিচ্ছিন্নদের একত্রিত করে। এরা যেন ভালবাসার সেই বৃক্ষ হয় যার ফল হিংসা-বিদ্বেষের তিক্ততা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এরা যেন ছায়াদার বৃক্ষ পরিবেষ্টিত সেই কূপের ন্যায় হয় যেখানে পরিচিত অপরিচিত সব ক্লান্ত পথিক বিশ্রাম নেয় এবং যার শীতল পানি তৃষিতদের তৃষ্ণা নিবারণ করে ও যার ছায়ানীড় অসহায়দের আশ্রয় দেয়। এরা যেন অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে নিবৃত্তকারী আর নির্যাতিতদের বন্ধু হয়। স্বয়ং মৃত্যুকে বরণ করে পৃথিবীবাসীদের জীবনদায়ী হয়। নিজেরা কষ্ট করে অন্যদের সুখ প্রদানকারী হয়। তারা যেন খুব সাহসী, সচ্চরিত্রবান এবং এমন দানশীল হয় যার দস্তরখান সবার জন্য উন্মুক্ত হয়। তারা যেন পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী এবং মিতব্যয়ী হয় ও অপচয়কারী হয়ে অন্যদের সামনে লজ্জিত না হয়। হে আমার পথপ্রদর্শক! তারা যেন ধর্মের প্রচারকারী হয়। ইসলাম বিস্তৃতকারী, হারানো গুণাবলী পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া তাক্বওয়ার পথসমূহ আলোকিতকারী, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বীরপুরুষ, **'লাম্মা ইয়াল হাকু বিহীম'** এর বাস্তবায়নকারী, পারস্য বংশীয়দের সুন্নত সংরক্ষণকারী হয়। হে আল্লাহ্! তারা যেন তোমার আত্মসম্মানের সংরক্ষণকারী, তোমার ধর্মের জন্য আত্মনিবেদিত, তোমার রসূলের জন্য উৎসর্গীত হয়। আর নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান এবং তাঁর (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)] জন্য এদের উৎসর্গীত কর। হে আমার মালিক! তারা যেন তোমার, হ্যাঁ! শুধু তোমারই দাস হয়। জাগতিক বাদশাহ্‌দের সামনে তাদের মাথা যেন নত না হয়, কিন্তু তোমার দরবারে যেন তারা সর্বাধিক বিনয়ী হয়। তাদের সৎ ও পবিত্র বংশধর দান কর। তারা যেন জগদ্বাসীকে ঐশীজ্ঞানের পথে পরিচালিত করে, একটি চিরস্থায়ী পুণ্যের বীজ বপনকারী, পুণ্য সমূহকে আরো উন্নতকারী, মন্দলোকদের সংশোধনকারী, আধ্যাত্মিক মৃত্যুকে ঘৃণাকারী এবং আধ্যাত্মিক জীবনের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়'।

'হে আমার চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী খোদা! তারা এবং তাদের সন্তানরা বংশ পরম্পরায় যেন পৃথিবীতে তোমার কাছে আমানত রূপে থাকে। শয়তান যেন তাদের ক্ষতি করতে না পারে। তারা যেন তোমার এমন সম্পদে পরিণত হয় যাকে কেউ চুরি করতে না পারে। তারা যেন তোমার ধর্মের প্রাসাদের জন্য কোনার পাথর হয় যাকে কোন রাজমিস্ত্রী উপেক্ষা করতে না পারে। তারা যেন তোমার উদ্যত তরবারিসমূহের একটি তরবারি হয় যা অনিষ্টের সব মূল কর্তন করে দেয়। তারা যেন তোমার মার্জনার প্রতিচ্ছবি হয়। তারা যেন বিপদ মুক্তির সুসংবাদ দাতা হয়। হ্যাঁ, হে চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী খোদা ! তারা যেন তোমার সেই শিঙ্গা হয় যা তুমি তোমার পথহারা বান্দাদের একত্রিত করার জন্য বাজিয়ে থাক। মোটকথা, তারা যেন তোমার হয় এবং তুমি তাদের হও। এমনকি তাদের প্রত্যেকে যেন এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখে বলে উঠে,

আমি তুমি, তুমি আমি
আমি দেহ তুমি প্রাণ
কোন ব্যক্তি যেন এটা বলতে না পারে
আমি ও তুমি ভিন্ন সত্তার অধিকারী।

আমীন সুম্মা আমীন ওয়া বেরাহমাতিকা আসতাগীস ইয়া রাব্বাল আলামীন'।

আল্লাহ্ করুন এ দোয়া যেন জামাতের সকল সদস্যের পক্ষে পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করতে থাকুন এবং তাঁর সন্তানদের তাঁর উপদেশ সমূহ পালনের সৌভাগ্য দিন।

দ্বিতীয় জন হচ্ছেন আমাদের জামাতের বুযূর্গ মুকাররম মওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আহমদ সাহেব মুরুব্বী সিলসিলাহ্, পিতা-মরহুম মুকাররম মওলানা আব্দুর রহমান সাহেব। আব্দুল ওয়াহ্হাব আহমদ শাহেদ সাহেব **১১ই** সেপ্টেম্বর **২০১১** তারিখে প্রায় দেড় মাস গুরুতর অসুস্থ থাকার পর মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহেদ সাহেব মুরুব্বী সিলসিলাহ্ ৫ই সেপ্টেম্বর, **১৯৪৩** তারিখে আযাদ কাশ্মীরের কোটলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই শিক্ষার্জন করেন। **১৯৬৭** সালে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি পাকিস্তানের দশটি স্থানে জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। এরপর **১৯৯১** সাল থেকে **১৯৯৯** সাল পর্যন্ত নাযারাত দাওয়াত

ইলাল্লাহ্‌র অধীনে বিভিন্ন জেলাতে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের বাইরে ১৯৭৬ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তাঞ্জানিয়াতে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য পান। এরপর পুনরায় তাঞ্জানিয়াতেই জুলাই ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মুরব্বী হিসেবে দারুয্ যিয়াফত রাবওয়াতে সেবা করার সৌভাগ্য পান। এরপর কেন্দ্রীয় ইসলাহ্ ও ইরশাদ দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। তিনি খুবই প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী, মিশুক ও হাস্যবদনের মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর ভালবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। অতিথি পরায়ণ ও গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সর্বজন প্রিয় মানুষ ছিলেন। জ্ঞান পিপাশু ছিলেন। আল্ ফযল ও অন্যান্য পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ লিখতেন। চারটি পুস্তক রচনা করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ দিল্লীর ঐতিহ্যবাহী আধ্যাত্মিক পথনির্দেশনাকারীদের পরিবার, যারা ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রেখেছিলেন– তাদের গদ্দীনশীন ছিলেন। তাদের মধ্য থেকেই হযরত মওলানা মাহবুব আলম সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লী থেকে হিজরত করে গুজরাতের 'চাক মিয়ানা ঢিল্লোতে' বসবাস শুরু করেন। অতঃপর এখান থেকে শিক্ষা লাভের উদ্দেশে কাশ্মীর যান।

তিনি 'গুই' অঞ্চলে থাকা অবস্থায় ইমাম মাহদী (আ.)-এর অবির্ভাবের কথা জানতে পারেন। তিনি প্রায়শঃই বলতেন, এখন একজন ঐশী সংশোধনকারী ব্যক্তির আগমনের সময়। ইমাম মাহদীর এসে যাওয়ারই কথা। এ ধারণায় মগ্ন থাকা অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হয়ে গেছে। অতএব তিনি খোঁজ-খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং নিজ শিক্ষক হযরত মওলানা বুরহান উদ্দিন সাহেব জেহলমীর সাথে সাক্ষাত করেন আর নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। আপনিও নিদর্শনাবলী অনুযায়ী যাচাই করুন। সেই সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোরে অবস্থান করছিলেন। তিনি লাহোরে পৌঁছান এবং সরাসরি তাঁর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বয়আত করে ফিরে আসার পর তাঁর চরম বিরোধিতা হয় তদুপুরি অনেক পুণ্য স্বভাবের মানুষ তাঁর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করেন।

তৃতীয় জন হচ্ছেন, মুকাররম আব্দুল কাদের ফাইয়ায সাহেব চান্ডিও, মুরুব্বী সিলসিলাহ্। তাঁর পিতা হলেন মুকাররম মাস্টার মরহুম গোলাম মোহাম্মদ সাহেব চান্ডিও। তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

মরহুম সন্তানদের স্কুলে ছেড়ে আসার জন্য যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে তিনি হার্ট এট্যাকে আক্রান্ত হন। তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছানো হয় কিন্তু আল্লাহ্‌র তকদীর অনুযায়ী তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১লা মে ১৯৭৪ইং তারিখে তিনি 'শাহেদ' ডিগ্রি লাভ করে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। তিনি পাকিস্তানে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ইসলাহ্ ও ইরশাদ বিভাগে এবং ওয়াকফে জাদীদ এর অধীনে চৌদ্দটি স্থানে ধর্মের সেবা করার সুযোগ পান। দেশের বাইরে তাঞ্জানিয়ায় দু'বার সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। তিনি 'নগর পারকারের' মিটঠিতে নায়েব নাযেম ওয়াকফে জাদীদ হিসাবে সেবা করার সুযোগ পান।

মৃত্যুকালে করাচীতে কর্মরত ছিলেন। মরহুম অত্যন্ত ভাল মনের অধিকারী, নেক স্বভাব বিশিষ্ট, হাস্যবদন এবং সচ্চরিত্রবান মানুষ ছিলেন। যে জামাতেই যেতেন সেখানকার সবাইকে আপন করে নিতেন। অতিথি সেবক, গরীবের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও গুণগ্রাহী বান্দা ছিলেন। তাঁর ভেতর সহ্য করার দারুণ ক্ষমতা ছিল। কেউ কষ্ট দিলে তাঁর সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন এবং কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে গভীর ভালবাসা ও প্রেমের সম্পর্ক ছিল। যুগ খলিফার প্রতিটি নির্দেশের সামনে নতজানু থাকতেন। নিজে পরিপূর্ণরুপে আনুগত্য করতেন এবং জামাতের সাবাইকে তা মেনে চলার জন্য উপদেশ দিতেন। মরহুমের বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতের সংখ্যা অনেক।

নিজ গন্ডীতে সকলের প্রিয় ও পছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন। যেসব জামাতে তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন আজও সেখানে তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়।

তিনি সিন্ধু প্রদেশের প্রখ্যাত চান্ডিও গোত্রের প্রথম ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন এবং সিন্ধু প্রদেশের মুরুব্বীদের মাঝে তিনি ছিলেন তৃতীয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকুন।

চতুর্থ জন হলেন করাচীর মুকাররম মুনীর আহমদ খাঁন সাহেব। তার পিতা হলেন মুকাররম আব্দুল করীম খাঁন সাহেব। তিনি গত ৭ই নভেম্বর ২০১১ই তারিখে ৭৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

তিনি হযরত হাকীম মৌলবী আনোয়ার হোসাইন খাঁন সাহেবের পৌত্র এবং হযরত আব্দুল রহীম নাইয়ার সাহেবের নাতী এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী মুকাররম ইয়াহিয়া খাঁন সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। তিনি একজন মেধাবী ও যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য পেয়েছে। রাবওয়াতে প্রথম রুটির প্লান্ট স্থাপনের সময় তিনি বিশেষভাবে সেবা করার সুযোগ পান।

তিনি ইংল্যান্ডের জলসা সালানার অনুবাদ বিভাগ ও কমিনিউকেশন ব্যবস্থাপনায়ও কাজ করার সুযোগ পান। তিনি নূহ (আ.)-এর নৌকার ব্যাপারে গবেষণা করেন এবং এ ব্যাপারে কুরআন, বাইবেল ও পুরাতন যুগের পুস্তক সমূহের আলোকে একটি পুস্তক প্রণয়নের সৌভাগ্য লাভ করেন, যা এখনো প্রকাশিত হয়নি। নূহ (আ.) এর নৌকা সংক্রান্ত তাঁর এ গবেষণার কথা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর নিজের দরসে কুরআন এবং বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্বেও উল্লেখ করেছেন।

অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত এবং খোলা মনে অন্যদের সাহায্য করতেন এবং তিনি মূসী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মামাতো বোন। অর্থাৎ ইনি হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের জামাতা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর সাথে ক্ষমাসূলভ ব্যবহার করুন। আমি যাদের উল্লেখ করেছি, নামাযের পর সকল মরহুমের গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

হযরত আলী (রা.)

মূলঃ ফজল আহমদ, ইউকে

ভাষান্তরঃ সিকদার তাহের আহমদ

(দ্বিতীয় কিস্তি)

পূর্ববর্তী খলিফাদের অধীনে ভূমিকা

আলী (রা.) নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, তার জোরালো মতামতও ছিল; তারপরও পূর্ববর্তী খলিফাদের অধীনে থেকে তিনি পরিপূর্ণ আনুগত্য করেছেন এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত আবু বকরের (রা.) খিলাফত কালে তিনি তরুণ ছিলেন এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও অনভিজ্ঞ ছিলেন। হযরত আবু বকরের (রা.) কাজকর্ম থেকে শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বহু কিছু শিখেছেনও। বিশেষত, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনা ও বিভক্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) এসব বিপদ-আপদ শক্ত হাতে প্রতিহত করেছেন। আলী (রা.) হযরত আবু বকরের (রা.) সমস্ত হুকুম পালন করেছেন এবং বিশ্বস্ত বন্ধু, সহযোগী ও সমর্থনকারী মিত্রে পরিণত হয়েছিলেন।

হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফতের প্রথম কয়েকটি মাস মুসলমানরা মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছিল। কারণ, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর নতুন নেতৃত্বের অধীনে অভ্যস্ত হতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই হযরত ফাতেমা (রা.) ইন্তেকাল করেন। ফলে হযরত আলীর (রা.) জন্য এই মনোকষ্ট আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হযরত আবু বকরের (রা.) মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত কালেও আলী (রা.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কুরআন ও ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স [ইসলামী আইনের দর্শন ও বিজ্ঞান] সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান রাখতেন তিনি। তাই, হযরত উমর (রা.) তাকে জ্যেষ্ঠ/সিনিয়র বিচারকের দায়িত্ব দেন। আলীর (রা.) বিচার-বিবেচনার প্রতি আস্থা ছিল তার। সেজন্য কঠিন কঠিন মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসার ভার আলীর (রা.) প্রতিই অর্পণ করতেন হযরত উমর (রা.)।

হযরত উমরের (রা.) খিলাফত কালে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জেরুজালেম বিজয় হয়। তিনি সেখানে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করতে যান। জেরুজালেম যাওয়ার সময়ে তিনি (রা.) ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসন-কেন্দ্র মদিনার দায়িত্বভার হযরত আলীর (রা.) উপর অর্পণ করেন। খলিফা হযরত উমর (রা.) আলীর (রা.) প্রতি কতোটা আস্থা রাখতেন সেটা এই ঘটনা থেকেও বুঝা যায়।

আলী (রা.) অবশ্য সব সময়েই যুগ খলিফার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতেন না। মাঝে মাঝে তিনি ভিন্নমতও পোষণ করতেন। যেমন, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধলব্ধ সম্পদের [মালে-গণিমত] বণ্টনের বিষয়ে হযরত উমরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত হন নি। ভবিষ্যত বিপদ-আপদের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে খলিফা হযরত উমর (রা.) মালে-গণিমতের কিছু অংশ হাতে রাখার কথা বলেছিলেন। কিন্তু, আলী (রা.) বলেন, সবটুকুই বণ্টন করে দিতে হবে; কারণ, বিপদ-আপদের বিষয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা [তাওয়াক্কল] করা উচিৎ। তিনি হয়তো সৈনিকদের সমর্থন লাভ করেছিলেন। কারণ, পরবর্তীতে হযরত উসমানের সঙ্গেও তার একই মতপার্থক্য ঘটেছিল। এ সম্পর্কে Karen Armstrong বলেন:

"অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা ক্রমাগতভাবে মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবু তালিবের দিকে তাকাচ্ছিল। এটি প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, 'সৈনিকদের অধিকার' রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং এভাবে উমর ও উসমান - উভয়ের নীতিরই/কর্মপন্থারই বিরোধিতা করেছিলেন।"

(Islam -- A Short History, p.28)

তিনি হয়তো কয়েকটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কিন্তু, তারপরও তিনি তার পূর্ববর্তী খলিফাদের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। বিশৃঙ্খলার সময়ে তদন্ত করে রিপোর্ট করার জন্য হযরত উসমান (রা.) আলীকেই (রা.) নিয়োজিত করেছিলেন। তখন মিশরের একদল মুসলমান অভিযোগ তুলেছিল, আল-ফুসতাতে (বর্তমান কায়রো) মিশরের গভর্নরের কাছে কঠোর নির্দেশনা সম্বলিত একটি চিঠি নাকি পাঠানো হয়েছে। আসলে সেটি ছিল একটি জাল চিঠি। এই ষড়যন্ত্র উদঘাটনে বড় ভূমিকা রাখেন আলী (রা.)।

এমনকি হযরত উসমান (রা.) যখন তার বাসভবনে আক্রান্ত হন, তখনও বাড়ির সম্মুখভাগে পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিল আলীর (রা.) দুই ছেলে হাসান এবং হোসেইন। কিন্তু, দূর্ভাগ্যক্রমে বিদ্রোহীরা বাড়ির সামনের দিকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সবার মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয় এবং ইত্যবসরে বাড়ির পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে।

হযরত আলীর (রা.) খিলাফত

ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলার যুগে যখন তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) শহীদ হন, তখন হযরত আলী (রা.) ইসলামের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত উসমানও (রা.) মহানবী (সা.)-এর জামাতা ছিলেন। এছাড়া, তিনি সরল, অকপট এবং মর্যাদাবান নেতা ছিলেন। তাই, তার অসময়োচিত মৃত্যুর ঘটনায় আলী (রা.) হতভম্ব ও বিমর্ষ হয়ে যান।

হযরত আলী (রা.) খলিফা হতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু, সেই সময়ে মদিনার লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তখন দুই হাজারেরও বেশি বিদ্রোহী সেখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। তারা হযরত উসমানকে (রা.) হত্যা করেছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে মদিনার মসজিদে নববীতে মুসলমানগণ সমবেত হলো এবং মদিনার আনসার ও মুহাজেরদের মধ্য থেকে শোর উঠলো। তারা হযরত আলীকে (রা.) অনুরোধ করলো খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে

এবং আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করতে। সেদিন তারা সবাই হযরত আলীর (রা.) হাতে বয়আত করলো। তবে, উমাইয়া পরিবারের কেই কেউ অবশ্য বয়আত গ্রহণ করে নি। হযরত উসমানের রক্তমাখা জামা নিয়ে তারা সিরিয়াতে পালিয়ে যায়।

প্রথম ভাষণে হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থিত মুসলমানদেরকে বলেন:

"কা'বার পার্শ্ববর্তী এলাকা পবিত্র। আল্লাহ্ মুসলমানদের পরস্পরকে ভাই হিসেবে জীবন-যাপন করতে বলেন। তিনিই মুসলমান যিনি কাউকেই তার কথায় কিংবা কাজে আঘাত দেন না। মানুষের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। শেষ বিচারের দিনে আপনাকে আপনার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি পশুর সঙ্গে আচরণের জন্যও (জবাবদিহি করতে হবে)। তাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আনুগত্য করুন। তার আদেশ-নিষেধগুলোকে পরিত্যাগ করবেন না।"

আলী (রা.) জানতেন সামনে আরো কঠিন সময় আসছে। সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস এবং অরাজকতার দ্বার অবারিত হয়ে গেছে। এসব মোকাবিলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন, ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন। আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের জন্য অনেক কৌশলী হওয়াও দরকার। তিনি আশা করলেন তার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের পাশাপাশি বিভিন্ন মানুষের সহায়তায় এসব কাজ সম্পাদন করবেন।

তার প্রথম বক্তৃতার পরপরই একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে দেখা করে শরিয়াহ আইন প্রয়োগের কথা বলে এবং হযরত উসমানের (রা.) হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করে। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে তালহা এবং যুবায়েরও ছিলেন। তীব্র আবেগময় পরিস্থিতি তখনো বিরাজ করছিল। তা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) জবাব দেন:

"উসমানের মৃত্যুকে আমি বিনা প্রতিশোধে ছেড়ে দিব না। কিন্তু, তোমাদেরকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয় নি। দাঙ্গাবাজরা এখনো মদিনায় ক্ষমতাশালী হয়ে আছে। আর, আমরা এখনো তাদের কব্জায় আছি। আমার নিজের অবস্থানও নড়বড়ে। তাই, আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি, অপেক্ষা করো। যখনই পরিস্থিতি ঠিক হবে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করবো।"

এটি পরিষ্কার যে, সব সাহাবী এই জবাবে সন্তুষ্ট হন নি। কিন্তু, আলী (রা.) নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে কাজ শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন পদে তিনি তার বিশ্বস্ত লোকদেরকে বসাচ্ছিলেন। আঞ্চলিক প্রশাসকদের/গভর্নরদের অনেককেই পরিবর্তন করেছেন তিনি। যেমন, সালমান ফার্সি ও মালিক আল-আশতারকে গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। এসব পরিবর্তনের বিষয়েও সবাই একমত ছিল না। অনেকেই তাকে পরামর্শ দিয়েছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী/দলকে খুশি রাখার জন্য কিছু কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। এ সম্পর্কে ইবনে খালদুন বর্ণনা করেন:

"আলীকে খিলাফতের শুরুতেই আল-মুগিরাহ পরামর্শ দিয়েছিলেন, আয-যুবায়ের, মুয়াবিয়া এবং তালহাকে তাদের পদ থেকে অপসারণ না করতে। যতদিন পর্যন্ত না জনগণ তার হাতে বয়আত করতে সম্মত হয় এবং পুরো বিষয়টি সুসংহত হয়। এর পরে, তিনি যা চান তা করতে পারবেন। সেটি ছিল ভাল 'পাওয়ার পলিটিক্স' [শক্তির কূটনীতি, যে কূটনীতির পেছনে সামরিক শক্তির সমর্থন থাকে]। যাহোক, আলী এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা পরিহার করতে চেয়েছিলেন। কারণ, ইসলামে এসবের স্থান নেই।"
(ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা: ১৬৫)

হযরত উসমানের (রা.) মৃত্যু-পরবর্তী পরিস্থিতি আলীকে (রা.) গভীরভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। তিনি (রা.) সত্যি সত্যি মনে করতেন তৃতীয় খলিফা যে-সব সমস্যার সম্মুখিন হয়েছিলেন সেগুলোর জন্য তাকে ঘিরে থাকা বনু উমাইয়া পরিবারের লোকজনই দায়ী ছিল। তারা খলিফার বৃদ্ধ বয়সের এবং ধৈর্যশীলতার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল এবং তার অপব্যবহার করেছিল। এই কারণেই হযরত আলী (রা.) ইসলামী শাসনকেন্দ্র মদিনার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য অঞ্চলে কর্মরত তাদের বহু লোককে অপসারণ করেছেন।

চিঠি ও খুৎবার মাধ্যমে অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তার সুখ্যাতি ছিল। বহু বছর মহানবী (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার কারণে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। অমুসলিমদের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা ও সমবেদনা ইত্যাদি সদ্‌গুণের প্রশংসা করার মাধ্যমে তিনি এই জ্ঞান প্রয়োগ করলেন। অমুসলিমরা তখন মুসলিম শাসনের অধীনে আসছিল।

জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ)

অচিরেই, সেই একই সাহাবী তালহা এবং যুবায়ের হযরত আলীর (রা.) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহে মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী আয়েশাও (রা.) যোগ দেন। এটি ৬৫৬ সালের ডিসেম্বরের ঘটনা। হযরত উসমানের (রা.) হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানে আলী (রা.) ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা হতাশ হয়ে যায় এবং বিদ্রোহ করে। হযরত আলীও (রা.) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন এবং হযরত উসমানের (রা.) হত্যাকারীদেরকে শায়েস্তা করতেও চাচ্ছিলেন। সেজন্য অসদ্ভাব ও বিদ্বেষ বৃদ্ধির পরিবর্তে তিনি প্রথমে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন এবং এরপর হযরত উসমানের হত্যাকারীর বিচার সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। যাহোক, এই বাস্তবসম্মত কর্মপন্থা মানার ক্ষেত্রে সবার সমান ধৈর্য ছিল না।

হযরত উসমানকে (রা.) যখন হত্যা করা হয়, তখন আয়েশা (রা.) হজ্জে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে মক্কায় এক জন-সমাবেশে বক্তৃতা দেন। এরপর শত শত সৈন্য নিয়ে তিনি বসরাহ গমন করেন আরো সমর্থন লাভের আশায়। পথিমধ্যে আরো লোকজন তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং কাফেলাটি তিন হাজার লোকের সেনাদলে পরিণত হয়। তখন বসরার লোকদের জনমত বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, শহর দখলের পর নেতারা হযরত উসমানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারীদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে এবং সমূলে বিনাশ করে। তারা শত শত সন্দেহভাজন বিদ্রোহীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাদের মধ্যে যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করে। তখন বসরার সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছিল। এরপর আয়েশা (রা.) মুসলিম সাম্রাজ্যের বাকি অংশের কাছে সমর্থন চাইলেন [হযরত উসমানের] সন্দেহভাজন হত্যাকারীদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য। ফলে অশান্তি আরো বৃদ্ধি পেল।

বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য হযরত আলী (রা.) তার নিজস্ব সেনাদল নিয়ে বসরাহ যেতে বাধ্য হলেন। কুফা থেকে নয় হাজার লোক তার সঙ্গে যোগ দিল। বসরায় পৌঁছানোর পর তিনি আয়েশা (রা.)-এর কাছে শান্তি-বার্তাবাহী প্রতিনিধি-দল পাঠালেন নিম্নলিখিত বাণী সহকারে:

"প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি খুবই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু, প্রথমে খলিফার হাতকে শক্তিশালী না করে আপনি কীভাবে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে হাত মেলালেন? ... আপনি যদি সত্যি সত্যিই বিবাদের পরিসমাপ্তি চান, তাহলে খলিফার ঝান্ডাতলে সমবেত হন। জনসাধারণকে

গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিবেন না।" মনে হচ্ছিল উভয় পক্ষই শান্তি স্থাপন করতে যাচ্ছে। কিন্তু, আবদুল্লাহ বিন সাবার নেতৃত্বাধীন একটি দল অনুধাবন করলো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তারা হযরত উসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী হিসেবে ধরা পড়ে যাবে। তাই, রাতের রাতের আঁধারে তাদের দলটি হযরত আলী (রা.) ও আয়েশার (রা.) শিবির দু'টির মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দিল। তারা হযরত আলীর (রা.) শিবিরে খবর দিল যে, অপরপক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আবার, হযরত আয়েশার (রা.) শিবিরে গিয়েও একইভাবে বলল, হযরত আলীর (রা.) লোকজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে, পুরোদস্তুর লড়াই বেঁধে গেল। হযরত আলী (রা.) এই ভয়টিই করছিলেন। মুসলমানদের দুই দলের এই লড়াইয়ে দশ হাজার মুসলমান মারা গেল। পরিশেষে যদিও খলিফা হযরত আলীর (রা.) দলই বিজয়ী হলো; কিন্তু, এই অনাবশ্যক রক্তপাতের ঘটনায় তার হৃদয়েও রক্তক্ষরণ হতে থাকলো।

এই যুদ্ধটি 'জঙ্গে জামাল' (উটের যুদ্ধ) নামে পরিচিত। বসরাতে আলী (রা.) যদিও এই বিদ্রোহ দমন করলেন, তথাপি বিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকলো। কোনো প্রকারের নিগ্রহ না করে, সম্মানের সঙ্গেই হযরত আয়েশাকে (রা.) মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আলী (রা.) যখন শুনলেন তালহা এবং যুবায়ের মারা গিয়েছেন, তাদের বৈরিতা সত্ত্বেও তিনি তাদের জন্য অশ্রুপাত করলেন। তিনি বললেন, ভুল বোঝাবুঝির ফলেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তারা দু'জনই [তালহা এবং যুবায়ের] মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি [আলী (রা.)] একবার মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছেন:

"সব নবীরই একজন শিষ্য ছিল আর আমার শিষ্য হলো আয্-যুবায়ের।"

কেউ যদি মনে করেন যে, এই লড়াইয়ের জন্য আলী (রা.) যশ ও গৌরবের অধিকারী হয়েছেন -- এটা পুরোপুরিই ভুল। আসলে এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে তাকে নিপতিত করা হয়েছিল। দুঃস্কৃতকারীরা আসলে ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছিল অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

হযরত উসমানের (রা.) হত্যাকান্ডের সঙ্গেও হযরত আলী (রা.) কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। এমনকি যে-সব ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ঘটনার পরিণতি হিসেবে হযরত উসমান (রা.) নিহত হন, সেগুলোর সঙ্গেও হযরত আলীর (রা.) কোনো সংশিষ্টতা ছিল না। আল-তাবারির বর্ণনায় দেখা যায়, খলিফা হওয়ার পর তার প্রথম খুতবায় হযরত আলী (রা.) এই হত্যাকান্ডের নিন্দা করেন এবং বিদ্রোহীদেরকে শয়তানের দোসর বলে অভিহিত করেন। উপস্থিত মুসুলীদেরকে তিনি একজন মুসলমান ভাইয়ের রক্তপাত ঘটানোর মতো নিকৃষ্ট কাজের ভয়াবহতার কথাও স্মরণ করান। এই অবস্থান থেকেই তিনি প্রথমে মুসলমানদের মধ্যে শান্তি এবং একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে চান।

মুয়াবিয়ার সঙ্গে বিরোধ

হযরত আলীর (রা.) খিলাফত ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া। ফলে ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বেঁধে যায়। এটি সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ নামে পরিচিত। অবশেষে তারা মধ্যস্থতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু, আযরুহ-তে [একটি স্থানের নাম] তা সমাধা হওয়ার পরিবর্তে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আলীর (রা.) সেনাবাহিনী থেকে চার হাজার সৈন্যের একটি দল তাকে ছেড়ে চলে যায় এবং তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে এই দলটি 'খারেজি' নামে পরিচিতি লাভ করে। তারা টেসিফোনে লুটতরাজ করে এবং এরপর ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে নহরওন্দ-এ হযরত আলীর (রা.) অনুগত বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। *[টেসিফোন (Ctesiphon) ইরাকে অবস্থিত একটি প্রাচীন নগরী। বর্তমানে একে আল-মাদায়েন বলা হয়। বাগদাদ থেকে ৩৫ কি.মি. দক্ষিণে টাইগ্রিস (দজলা) নদীর পূর্বতীরে এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। অনুবাদক]*।

তখন ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সমস্যাও উদ্ভুত হচ্ছিল। তারপরও, হযরত আলী (রা.) আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখেছিলেন। তিনি গভীর প্রার্থনায় নিমগ্ন হতেন। নিয়মিত ফরজ আদায়ের পাশাপাশি তিনি নফল নামাজও পড়তেন।

প্রায়ই তিনি রাতভর ঈবাদতে রত হতেন। তার প্রার্থনার কারণেই তিনি ও প্রথম যুগের মুসলমানগণ নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন। নতুবা, তখনকার পরিস্থিতি এতোটাই প্রতিকূল ছিল, তাদের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র হচ্ছিল যে, পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারতো।

কোনো এক ব্যক্তি হযরত আলীকে (রা.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

"মানুষ কেন আপনার সঙ্গে মতভেদ করে? আর, তারা কেন আবু বকর (রা.) এবং উমরের (রা.) সঙ্গে মতভেদ করে নি?"

তিনি (রা.) জবাব দেন:

"কারণ, আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) আমার মতো লোকদের ইনচার্জ/তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর, আজ আমি তোমার মতো লোকদের নেগরান/তত্ত্বাবধায়ক।"

ন্যায়বিচারের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি তার অনুগামীদেরকে বলতেন, লোকদের সঙ্গে সে-রকম আচরণ করো যে-আচরণ তুমি তাদের কাছে প্রত্যাশা করো। অনুসারীদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর আগে, এই চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়েই তিনি মুসলিম বিশ্বে সুস্থিত অবস্থা এবং ভারসাম্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

নহরওন্দে খারেজিদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করায় তিনি কিছুটা সমর্থন ও আনুকূল্য হারান। খারেজিরা চাচ্ছিল তাদের দৃষ্টিতে সত্যিকারের মুসলিম নেতৃত্ব, যা কিনা কুরআনী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে; আর, যারা রাজনৈতিক ফায়দা গ্রহণ করতে চায়, তাদের সঙ্গে কোনো আপোষ করা যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু সমর্থন পেতে থাকলো, যদিও 'মোটিভ' বা অভিপ্রায় সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা ভ্রান্তিমূলক ছিল।

সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা.) বসরাতে [বর্তমান ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল এলাকায়] কিছু সময় কাটান। সেখানে তিনি তার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে গভর্নর নিয়োগ করেন। এরপর, জানুয়ারি মাসে তিনি কুফাতে যান। কুফা ছিল ইরাকের তুলনামূলকভাবে একটি নতুন গ্যারিসন শহর/রক্ষীনগরী, যা-কিনা মাত্র বিশ বছর আগে গড়ে তোলা হয়েছিল। তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র মদিনা থেকে কুফাতে স্থানান্তর করেন। কুফা আধুনিক ইরাকে অবস্থিত। এদিকে ক্ষমতার আরেকটি কেন্দ্রস্থল দামাস্কাস রয়ে গেল মুয়াবিয়ার নিয়ন্ত্রণে। পরবর্তীকালের জন্য এই সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এরপরে আর কখনোই মদিনা ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়নি।

আলী (রা.) অত্যন্ত ভদ্র ও সরল মানুষ ছিলেন। কিন্তু, তাকে এখন রাজনৈতিক কৌশলের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

(বি.দ্র. প্রথম কিস্তিতে পবিত্র কুরআনের আয়াতের স্থলে শুধু অর্থ দেয়া হয়েছিল)

[The Review of Religions, December 2007 অবলম্বনে]

চলবে

উকিলে আ'লার দপ্তর থেকে

বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ইং তারিখে নরওয়ের অস্‌লো-তে হুযূর (আই.) জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

খুতবা দানের পূর্বে হুযূর (আই.) মসজিদ 'বাইতুন নসর'-এর নাম-ফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদটি উদ্বোধন করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা তওবা-র ১৮ থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে হুযূর (আই.) খুতবা শুরু করেন, যার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা হলো :

"আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, নিশ্চয়ই সে-ই আল্লাহ্‌র মসজিদ সংরক্ষণ করার যোগ্য। অতএব আশা করা যায়, এসব লোকই হেদায়েত-প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে" (৯ : ১৮)।

হুযূর (আই.) বলেন, "আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আজ আমরা নরওয়েতে এই সুন্দর মসজিদটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলাম। এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একমাত্র পন্থাই হচ্ছে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা। আমি আশা করি যে, প্রত্যেক আহমদী-ই প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে মসজিদে আসতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে।"

হুযূর (আই.) বলেন, "মসজিদ বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে শান্তি ও ঐক্য বর্ধিত করা, এক-খোদার ইবাদত করা, ইসলামের সুন্দর শিক্ষা মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত করা এবং বিশ্বকে 'শান্তি-নিবাস'-এ পরিণত করা"। হুযূর (আই.) বলেন, "একজন খাঁটি মু'মিনের জন্যে ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। মু'মিনরা যখন আল্লাহ্‌কে সর্বাধিক ভালবাসেন এবং একনিষ্ঠভাবে দোয়া করেন, এমন মু'মিনরাই নিয়মিতভাবে মসজিদে হাজির হয়ে থাকেন। মু'মিনদের আরেকটি চিহ্ন হলো, তারা শ্রবণ করেন এবং মান্য করেন, যার অর্থ হচ্ছে, তারা পবিত্র কুরআনের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ মেনে চলেন। কুরআন আমাদেরকে নির্দেশ দেয়, যেন আমরা আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করি। জামাতের ওহ্‌দাদার হিসেবে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলোও এতে সংযুক্ত রয়েছে। সে-সব মহিলা, যারা লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র কোন পদাধিকারিনী, তাদেরকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পর্দাপ্রথার যাবতীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে, অন্যথায় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনকারীনিদের মধ্যে তাদেরকে গণ্য করা যাবে না। ভোট দানের সময় এ বিষয়টি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক নির্ধারিত বয়আতের শর্তসমূহ মান্য করার প্রতি মনযোগী কি-না, তার প্রতিও খেয়াল রাখা আমাদের কর্তব্য। অহংকার পরিত্যাগ এবং নম্রতা অবলম্বন করার প্রতিও আল্লাহ্ আমাদেরকে উপদেশ দান করেছেন"।

হুযূর (আই.) বলেন, "যারা আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করে, তাদের আরেকটি চিহ্ন হচ্ছে, তারা পরকালের উপর আস্থা রাখে। আমরা কেবল তখনই সত্যিকার ভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে পারি, যখন আমরা এ বিশ্বাস করবো যে, মৃত্যুর পর আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে"।

হুযূর (আই.) বলেন, "মু'মিনরা যখন নামাযের জন্যে মসজিদে একত্রিত হয়, তখন তারা কেবল খোদার একত্বই স্পষ্ট করে না, পারস্পরিক প্রীতির নিদর্শনও প্রদর্শন করে এবং জামাতের মধ্যকার একতার চিহ্নও প্রকাশ করে।"

এ ধরণের মু'মিনদের আরেকটি চিহ্ন আছে, তারা যাকাত আদায় করে এবং আর্থিক কুরবানীসমূহও পেশ করে। নূতন এ মসজিদটি নির্মানের জন্যে নরওয়ে জামাতের কুরবানীর প্রশংসা করে হুযূর (আই.) বলেন, "আমি আশা করি, এসব কুরবানী করার পেছনে উদ্দেশ্য হলো মসজিদটি আবাদ করা, আমাদের ঈমানকে মজবুত করা, প্রতিবেশীদের দায়িত্বসমূহ পালন করা, ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা সঞ্চার করা, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে পুরা করা এবং নূতন উদ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করার দায়িত্ব গ্রহণ করা। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরকে যত বেশী ভালবাসবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তত বেশী ভালবাসবেন"।

খুতবার শেষ দিকে হুযূর (আই.) জামাতকে করাচীর সফির আহমদ বাট্ সাহেবের মর্মান্তিক শাহাদতের খবর অবহিত করেন এবং জুমুআর নামাযের পর শহীদের নামাযে জানাযা গায়েব পড়ান।

বিগত ৭ অক্টোবর ইং তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জার্মানীর হামবুর্গ-এ জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, ঐশী মহাপুরুষদেরকে নির্যাতন করা নূতন কোন ঘটনা নয়, এ ধরনের ঘটনা স্মরণাতীত কাল থেকেই চলে আসছে। পবিত্র নবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ কর্তৃক বরণকৃত নির্যাতনের ঘটনাসমূহ সবারই জানা আছে। অনরূপভাবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)কেও কাবুলে তাঁর দু'জন নিষ্ঠাবান অনুসারীর মর্মান্তিক শাহাদতের দু:খ সইতে হয়েছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তাঁর জামাতকে এ দোয়া করতে উপদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ (রাহে.)-এর মত মজবুত ঈমান দান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, "জামাতের উপর

যেসব পরীক্ষা এবং ক্লেশ আসে, সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে সেই প্রেরণা যোগানো, যাতে আমরা অধিকতর সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে পারি; ওগুলো আসে উন্নতি লাভের জন্যে আমাদের পথকে মসৃন করতে, আমাদেরকে খোদার অধিকতর নৈকট্য দান করতে এবং অধিকতর নামাযী ও দোয়াকারী হবার প্রতি মনোযোগী করতে"।

হুযূর (আই.) বলেন, "এ যুগটা হচ্ছে কলম দ্বারা জেহাদ করার যুগ এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এ জেহাদের জন্যে আমাদেরকে যাবতীয় উপকরণ দান করেছেন। অন্য কোন ধর্ম ইসলামের মহত্ত্ব ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। আজ আমাদের জামাত সম্ভাব্য সব উপায়ে বিশ্বের দরবারে পবিত্র নবী (সা.)-এর সত্য ও মূল-চরিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিরুদ্ধবাদীদের চরিত্র উন্মোচন করে তাদের অপবিত্র আক্রমণসমূহ থেকে তাঁকে আমরা রক্ষা করছি। আমরা কেবল পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে আনীত আপত্তি সমূহের খন্ডন-ই করছি না, একই সাথে অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছি"।

হুযূর (আই.) বলেন, "আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আজ তাদের বিরোধীতার সব সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাদের কঠোর নির্যাতনের বিপরীতে পাকিস্তানের আহমদীরা অসাধারণ ধৈর্য ও স্থৈর্য্য প্রদর্শন করেছে। এসব কুরবানী ও আবেগ কেবল তখনই সুফল বয়ে আনবে, যখন আমরা আল্লাহ্‌র সমীপে সেজদাবনত হই এবং অশ্রু দ্বারা আমাদের জায়নামায সিক্ত করি। বিশেষ করে পাকিস্তানী আহমদীদের উচিত ব্যগ্রতার সাথে দোয়া করা এবং প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে রোযা রাখা। যন্ত্রণাকাতর মানুষের দোয়াসমূহ আল্লাহ্ শোনেন। অতএব চলুন, আমরা গভীর যন্ত্রণা ও উত্তাপ নিয়ে দোয়া করি, যাতে সেগুলো গৃহীত হয়। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেন, প্রার্থনা গৃহীত হবার ব্যাপারে যে কারো সন্দিহান বা নিরাশ হওয়া উচিত নয়। সর্বাধিক নম্রতা ও শ্রদ্ধার সাথে এবং সৃষ্টিকর্তা, জীবিকাদাতা, ক্ষমাকারী, দয়ালু এবং বিচার দিবসের প্রভু হিসেবে খোদার গুণসমূহ সম্বন্ধে সচেতন থেকে দোয়া করা উচিত"।

হুযূর (আই.) বলেন, "আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সেবক, যার কাছে আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি তোমার এবং তোমাকে যারা ভালবাসে, তাদের সাথে থাকবো'। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সময় থেকেই আমরা বড় বড় পরীক্ষা ও দারুন কষ্টের মধ্যদিয়ে আসছি, কিন্তু আমরা উন্নতি করে যাচ্ছি এবং আজ জামাত ২০০ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর জামাতকে ভালবাসেন, যাঁকে তিনি ইসলামে নূতন জীবন ফুঁৎকারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। চলুন, আমরা নিজ দায়িত্ব ভুলে না গিয়ে তা পূর্ণ করি, আর সে দায়িত্ব হচ্ছে উৎসাহপূর্ণ দোয়া করা, যাতে স্বর্গের মসনদ আন্দোলিত হয়।

খুতবার শেষভাগে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের সেখুপুড়ায়, শাহাদত বরণকারী মাষ্টার রানা দিলওয়ার হোসেন, রাবওয়ার ফজলে ওমর হাসপাতালের একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী জনাব আব্দুল জব্বার এবং নাসির আহমদ জাফর, পিতা-মৌলানা জাফর আহমদ সাহেবের মর্মান্তিক শাহাদতের খবর জামাতকে অবহিত করেন এবং জুমুআ নামাযের পর শহীদদের নামাযে জানাযা গায়েব পড়ান।

বিগত ১৪ অক্টোবর, ২০১১ ইং তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) হল্যান্ডের নানস্পীটে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, "এ যুগে আল্লাহ্ এটা নির্ধারণ করেছেন যে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে অন্য সব ধর্মের পর প্রতিষ্ঠিত করবেন। আহমদী হিসেবে যেভাবে আমরা জানি যে, বিশেষভাবে খৃষ্টানদের এবং তাদের ত্রিত্ববাদের উপর আল্লাহ্ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। আহমদীয়া জামাত ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায় অথবা অন্য কোন ধর্ম এমন অটুট যুক্তি ও স্বর্গীয় নিদর্শন দ্বারা এ মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। বাস্তবে খৃষ্টানদের মধ্যে অনেক পবিত্র আত্মার লোক একথা স্বীকার করছে যে, কেবল আহমদীয়াতের মাধ্যমেই সত্য হেদায়াত পাওয়া যায় এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) খোদা কর্তৃক প্রেরিত। ইসলাম প্রচারে আমাদের জামাতের প্রচেষ্টা অনেক খৃষ্টান এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে"।

পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশে আহমদীদের নির্যাতিত হবার বিষটি উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, "পাকিস্তানী আহমদীদের বিরুদ্ধে এসব নৃশংসতা সাধন করা সত্বেও তারা এখনো তাদের দেশের নিরাপত্তা ও অখন্ডতার জন্যে দোয়া করে"। হুযূর (আই.) বলেন, "এ জামাত সারা বিশ্বে পবিত্র নবী (সা.) এর প্রকৃত মর্যাদা প্রসারিত করার প্রচেষ্টা সর্বদাই জারী রাখবে এবং জামাতের এ প্রচেষ্টা মুসলিম- বিরোধী শক্তিগুলো এবং খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হচ্ছে"।

হুযূর (আই.) বলেন, "বিগত খুতবায় আমি পাকিস্তানে আহমদীদেরকে সপ্তাহে একদিন রোযা রাখার উপর জোর দিয়েছিলাম। রোজা রাখার জন্যে যদি কোন একটি দিন নির্ধারণ করা হয়, যেমন-সোম অথবা বৃহস্পতিবার, তাহলে সেটাই যথাযথ হবে। যেভাবেই হোক, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যে কোন কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ভালবাসা আকর্ষণ করা। সাধ্যমত যে কোন কুরবানী করা, নৈতিক মানের উন্নয়ন সাধন করা, ইসলামের বাণী প্রচার করা আর ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ খন্ডন করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারি। জামাতে আহমদীয়া, হল্যান্ডেরও উচিত এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করা"।

ইসলামকে গালমন্দ করার ক্ষেত্রে ডাচ-নাগরিক, যারা সব সীমা অতিক্রম করেছে, তাদের সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, "ইসলাম ও পবিত্র নবী (সা.) অনাগত ভবিষ্যতের জন্যেই এসেছেন এবং কেউ তাদেরকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। হল্যান্ড-এ অনেক শোভন-ব্যক্তি রয়েছেন, যারা এ ধরনের বাগ্মিতার সাথে একমত নন; আমাদের জামাতের উচিত তাদের কাছে যাওয়া এবং ইসলামের সুন্দর শিক্ষাসমূহ তুলে ধরা। **সে সব লোকের সাথে যোগযোগ করুন, যারা ভালবাসা ও ঐক্য গড়তে ইচ্ছা রাখে। পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, শান্তি ও একতার বাণী প্রচার করুন"।**

হুযূর (আই.) বলেন, "প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর জামাত হচ্ছে সেই জামাত, যারা সারা বিশ্বকে পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে এবং বিশ্বকে তাঁর পতাকাতলে একত্রিত করতে চলেছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ছিলেন সেই সত্ত্বা, যিনি ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্মের আক্রমণকে প্রতিহত করেন। তিনি (আ.) পবিত্র নবী

(সা.)-এর সম্মান বর্ণনা করার জন্যে তাঁর সবকিছু উৎসর্গ করেছেন"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন, "আমাদের প্রচারকগণ আফ্রিকাতে ইসলাম-প্রসারের এক বিস্ময়কর কাজ করেছেন। তাঁরা সেসব লোকদেরকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করান, যারা ত্রিত্ববাদ গ্রহণ করেছিল। ফলে এখন তারা এক-খোদায় বিশ্বাস করছে এবং পবিত্র নবী (সা.) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) পবিত্র নবী (সা.) এর মর্যাদা উন্নত করার জন্যে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন। প্রিয় নবী (সা.) এর জন্যে তাঁর ভালবাসার পরিচয় তাঁর (আ.) লিখাসমূহ থেকে সপ্রমাণিত। তিনি (আ.) বলেন, "সে-সব লোকদের সাথে আমরা কীভাবে সমঝোতা করতে পারি, যারা আমাদের পবিত্র নবী (সা.) এর বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করে এবং অন্যায়ভাবে তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে বিরত হয় না? আমি সত্যই বলছি যে, আমি সর্প এবং নেকড়ে বাঘের সাথেও শান্তি রচনা করতে পারি, কিন্তু তাদের সাথে নয়, যারা আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলীহি ওয়াসসালাম-কে আক্রমণ করে, যিনি আমার পিতা-মাতার চাইতেও আমার কাছে অধিক প্রিয়"।

স্বপ্নের মাধ্যমে হেদায়াত পেয়ে কিভাবে মহৎ লোকেরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কে চিনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন, তার বেশ ক'টি ঘটনা হুযূর (আই.) বর্ণনা করেন। হুযূর (আই.) বলেন, "বিরুদ্ধবাদীদের ঔদ্ধত্যের কারণে আমাদের বিচলিত হবার কিছুই নেই। আমাদের উচিত খোদার সমীপে সেজদাবনত হয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং আমাদের আদর্শ ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে ইসলামের মূল শিক্ষা সম্প্রসারিত করা"।

খুতবার শেষভাগে বেলজিয়াম জামাতের প্রথম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপানের জন্যে হুযূর (আই.) জামাতকে দোয়া করতে বলেন।

বিগত ২১ অক্টোবর,২০১১ ইং তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ-তে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, সম্প্রতি আমার জার্মানী, নরওয়ে, হল্যান্ড ডেনমার্ক ও বেলজিয়াম সফরের সময় আমি আল্লাহ্‌র অশেষ দানের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি। এসব দেশের আহমদীদের মধ্যে আমি ঈমান, প্রত্যয় ও নিষ্ঠা দেখতে পেয়েছি। আমি এও দেখেছি যে, জামাতের ভাল-প্রতিমূর্তি দ্বারা অ-আহমদীরা বর্ধিত হারে ইতিবাচক ভাবে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা লাভের প্রতি আগ্রহী হয়েছে। এটা কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বার্তা প্রসারে এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসারে আমাদের প্রচেষ্টা আমাদের প্রত্যাশার চাইতেও অধিক ফলপ্রসূ হচ্ছে। বাস্তবে, এটাই হচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)কে দেয়া আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা"।

হুযূর (আই.) বলেন, "যখন আমি অন্যান্য দেশ সমূহ সফর করি, তখন সেখানকার সমাজের বিভিন্ন অংশের লোকদের সাথে সাক্ষাতের প্রচুর মওকা আসে এবং আমি তাদের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা তুলে ধরে এই মহিমান্বিত ধর্মের উপর তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসসমূহ অপরাসন করার প্রয়াস পাই। জার্মানীতে আমি দু'টি নূতন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছি। এ সুযোগে জার্মানীর বুদ্ধিজীবি ও কর্মকর্তাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে এবং ইসলাম সম্পর্কে আমি তাদের ভুল- ধারণা সমূহ দূর করতে সক্ষম হয়েছি।

হুযূর (আই.) বলেন, ফ্রাঙ্কফোর্টে আমি খোদ্দাম, লাজনা এবং আতফালের ইজতেমায় উপস্থিত হয়েছিলাম। আতফাল ও খোদ্দামের মধ্যে কর্তব্য পালন ও নিষ্ঠার রুহ্ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। ছোট বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে আসা লাজনাদেরকে হুযূর (আই.) জলসা ও ইজতেমার প্রোগ্রামসমূহ মনোযোগের সাথে শ্রবণ করার প্রতি জোর দেন এবং বাচ্চাদের নীরব রাখতে নির্দেশ দেন।

এরপর হুযূর (আই.) নরওয়ে গমন করেন এবং সেখানে 'বায়তুন নসর' উদ্বোধন করেন। এ মসজিদটি নির্মাণে নরওয়ে জামাত যে কুরবানী করেছে, সেজন্যে হুযূর (আই.) তাদের প্রশংসা করেন। কতিপয় তরবিয়তী বিষয়ে বক্তৃতা দান কালে হুযূর (আই.) বলেন, "মহিলা ও বালিকারা যদি সঠিক পথে চলে, তবে তা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের তরবিয়তের নিশ্চয়তা দান করবে"। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যে হুযূর (আই.) নরওয়ের সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নরওয়ের সংসদ ভবনে হুযূর (আই.)-এর সম্মানে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে হুযূর (আই.) নরওয়ের সংসদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। হুযূর (আই.) অনেক সংবাদ পত্র ও টি,ভি রিপোর্টারদেরকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। শান্তির প্রতিকৃতি হিসেবে স্থাপিত এ নূতন মসজিদটির খবর বিশদভাবে প্রচারিত হয়। নরওয়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথেও হুযূর (আই.) সাক্ষাৎ করেন, যিনি জামাতের ভালবাসা ও ঐক্যের-বার্তার প্রশংসা করেন। হামবুর্গ প্রত্যাবর্তন করে হুযূর (আই.) দু'জন এম, পি-র সাথে সাক্ষাৎ করে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করেন। অত:পর হুযূর (আই.) বেলজিয়াম সফর করেন এবং এর প্রথম মসজিদ 'বাইতুল মুজিব'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। অনেক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি এ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। একজন মেয়র বলেন, তিনি হুযূর (আই.) এর একথা শুনে খুবই আনন্দিত হয়েছেন যে, এ মসজিদটি কেবল মসজিদই নয়, বরং বেলজিয়াম এবং বাস্তবে পুরো অঞ্চলের জন্যেই শান্তির এক প্রতীক।

হুযূর (আই.) বলেন, "আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সবদিক দিয়েই সফর ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তাঁর পছন্দের লোকদের কর্মতৎপরতা সমর্থন করেন এবং উহার ক্ষেত্র প্রসারিত করেন। মানব কর্তৃক বানানো ধর্মসম্প্রদায় অল্প সময়ের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, কারণ ওগুলো মানব-প্রচেষ্টার উপর স্থাপিত।" হুযূর (আই.) বলেন, "এটা আল্লাহ্‌র জামাত এবং এটা বৃদ্ধি পেতে এবং দিবারাত্র উন্নতি করতে বাধ্য। আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টাসমূহকে মহিমান্বিত করুন, আমীন"।

খুতবার শেষভাগে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের শিয়ালকোটের খিবা বাজুয়া জেলার চৌধুরী গোলাম কাদের সাহেবের স্ত্রী খুরশিদ বেগমের দুঃখজনক মৃত্যুর খবর অবহিত করেন। হুযূর (আই.) জামাতের জন্য তার সেবা সমূহের কথা বলেন এবং জুমুআর নামাযের পর তার নামায জানাযা গায়েব পড়ান।

বিগত ২৮ শে অক্টোবর, ২০১১ ইং তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ-তে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, "পবিত্র নবী (সা.)-এর সাহাবাগণ যখন তাঁকে (সা.) অনুসরণ করার অঙ্গীকার করেছিলেন, তারা তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে খোদার সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তারা আল্লাহ্‌র আদেশাবলী অনুসরণ করেছিলেন এবং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করা। এজন্যে আল্লাহ্ তাদেরকে পর্যাপ্ত অনুগ্রহ দান করেছিলেন। আল্লাহ্ তাদের সেসব দাসদেরকে সর্বদা সাহায্য ও রক্ষা করেন, যারা তাঁর জন্যে যেকোন কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকে। যারা আল্লাহ্‌র সাথে খাঁটি সম্পর্ক স্থাপন করে, তারা তাঁর পবিত্র গুণাবলীর প্রতিবিম্ব হয়। তারা তাদের প্রতিবেশীদের প্রতি দয়ালু হয় এবং তাদের প্রতি কর্তব্যসমূহ পালন করে। প্রকৃত ঈমানের নির্যাস হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে পরিচালিত করা এবং তাদেরকে মানবজাতির প্রতি কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

হুযূর (আই.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর লেখা সমূহ থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পড়ে শোনান। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, "মানুষ কেবলই পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতাহীন সেবা দিয়ে থাকে, পবিত্র কুরআন অনুসরণের মাধ্যমে যে খাঁটি ধার্মিকতা ও পবিত্রতার সৃষ্টি হয়, তা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এমন আধ্যাত্মিক অধ:পতনের কারণেই আল্লাহ্ এই নূতন ব্যবস্থা পাঠিয়েছেন। তোমাদের জীবনে সেই বিপ্লব আনতে আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাই, যেটা পবিত্র নবী (সা.)-এর সাহাবাগণ কর্তৃক ঘটানো হয়েছিল"। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, "ঐসব লোকের জীবন অভিশপ্ত, যাদের উদ্বিগ্নতা দুনিয়ার জন্যে। মানুষের উচিত, সব অহংকার ও ঔদ্ধত্য পরিহার করা, কারণ তাকে সর্বদাই স্বর্গীয় হেদায়াতের মুখাপেক্ষী হতে হয়। প্রকৃত 'মারেফত' (আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি) মানুষের 'অহংবোধ'কে অস্বীকার ও সত্ত্বার অবিদ্যমান হবার বিবেচনা দাবী করে এবং সর্বাধিক নম্রতাসহ খোদার বদান্যতার খোঁজে স্বর্গীয় তোরনে সেজদাবনত হতে নির্দেশ দেয়। হে সৌভাগ্যশালীরা! তোমাদের মুক্তির জন্যে যে শিক্ষা আমাকে দেয়া হয়েছে, উহা পুর্ণোদ্যমে অনুসরণ কর। খোদাকে এক এবং অদ্বিতীয় বিবেচনা কর এবং কোন আকার বা পদ্ধতিতেই তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার বানিও না। এ দুনিয়ার উপকরণসমূহ কাজে লাগাতে খোদা তোমাদেরকে বারণ করেন না, কিন্তু যে লোক উপকরণ সমূহের মধ্যেই তার সার্বিক বিশ্বাস নিবদ্ধ করে সে-ই হচ্ছে একজন প্রতিমা-পূজারী। আত্মাকে বিশুদ্ধ কর, নিজের রাগ ও অহংকারী ভাবাবেগকে দূরে স্থাপন কর এবং মানবজাতির জন্যে নম্র, ভদ্র এবং সহানুভূতিশীল হয়ে যাও। উৎসাহ ভরে খোদার আইন মেনে নাও এবং প্রার্থনা করার সময় প্রচুর মিনতি করো।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, খোদা সেইসব লোককে ভালবাসেন, যারা তাদের ঈমানের অধিকতর মর্যাদা দান করে এবং সর্বান্ত:করণে খোদার দাস হয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেছেন, "কেবল আমার হাতে বয়আত করার মাধ্যমেই কেউ আমার জামাতে প্রবেশ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে খাঁটি বশ্যতা প্রদর্শন করেছে"

আল্লাহ্‌র আদেশসমূহকে তোমার যাবতীয় কর্মকান্ডে অগ্রধিকার দান করো এবং ধার্মিকতায় নিখুঁত হয়ে যাও। পবিত্র কুরআনকে তোমার উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করো এবং একে অন্য সবকিছুর উপরে মূল্যায়ণ করো, কারণ, যাবতীয় ন্যায়পরায়ণতা এর উপরই নির্ভর করে।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, খোদা সেইসব লোককে ভালবাসেন, যারা তাদের ঈমানের অধিকতর মর্যাদা দান করে এবং সর্বান্ত:করণে খোদার দাস হয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেছেন, "কেবল আমার হাতে বয়আত করার মাধ্যমেই কেউ আমার জামাতে প্রবেশ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে খাঁটি বশ্যতা প্রদর্শন করেছে–সেই বশ্যতা, যাদ্বারা সে নিজের আকাঙ্খা সমূহ ত্যাগ করে প্রতিপদে আমাকে অনুসরণ করেছে। পবিত্র নবী (সা.) এর সাহাবাদেরকে শ্রদ্ধা করো এবং তাদের উদাহরণ অনুসরণ করো। খোদার **দৃষ্টিতে কেবল সে-ই এ জামাতের যোগ্য, যে এ জগতের মোহে আবিষ্ট নয়। আমি সত্যই বলছি যে, খোদা কেবল তাদেরকে ভালবাসেন এবং তাদের বংশধরদের মহিমান্বিত করেন, যারা তাঁর নির্দেশসমূহ মেনে চলে।** যারা খোদাকে মান্য করে, তারা কখনো ধ্বংস হয় না; কেবল তারাই ধ্বংস হয়, যারা খোদাকে ভুলে যায় এবং জগতের দিকে ঝোঁকে। আমি যা বলি, তা গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা করো এবং তোমাদের অবস্থা সেভাবে পরিবর্তন করো"।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, হে সেইসব লোক, যারা আমার সাথে খাঁটি সম্পর্ক রাখ! স্মরণ রেখো, তোমরা প্রত্যেকেরই মঙ্গল করবে, তা তারা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক, কারণ, পবিত্র কুরআন আমাদেরকে এ শিক্ষাই দান করে। প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ এবং দোয়া করতে থাকো, কারণ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতিত কিছুই লাভ করা যায় না। কিন্তু যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখন সব পথই খুলে যায়"।

হুযূর (আই.) বলেন, "বর্তমান সময়ে ঔদ্ধত্য ও মিথ্যা-অহংকারের কারণে অনেক বিবাদ এবং এমনকি মামলা পর্যন্ত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে আমাদেরকে ঐকান্তিকভাবে উদ্বিগ্ন হতে হবে। আমরা যদি খোদার খাঁটি জামাত হবার দাবী করি, তাহলে আমাদের উচিত হবে সর্বদা নিজেদের উপর নজর রাখা। আল্লাহ্ আমাদেরকে এরূপ করার তৌফিক দান করুন, আমীন"।

খুতবার শেষ ভাগে হুযূর (আই.) তাদের সবার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, যারা হুযূর (আই.)-এর স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁকে পত্র লিখেছেন এবং ফ্যাক্স-বার্তা প্রেরণ করেছেন।

[উকিলে আলা দপ্তর থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.) প্রদত্ত খুতবাসমূহের উপদেশবাণী জামাতের সদস্যদের কাছে পৌঁছাতে তা পত্রস্থ করা হলো।

অনুবাদ : **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

PRESS RELEASE 6th December 2011

World Muslim leader sends Message of Peace to Pope Benedict

World should judge religions on their true teachings

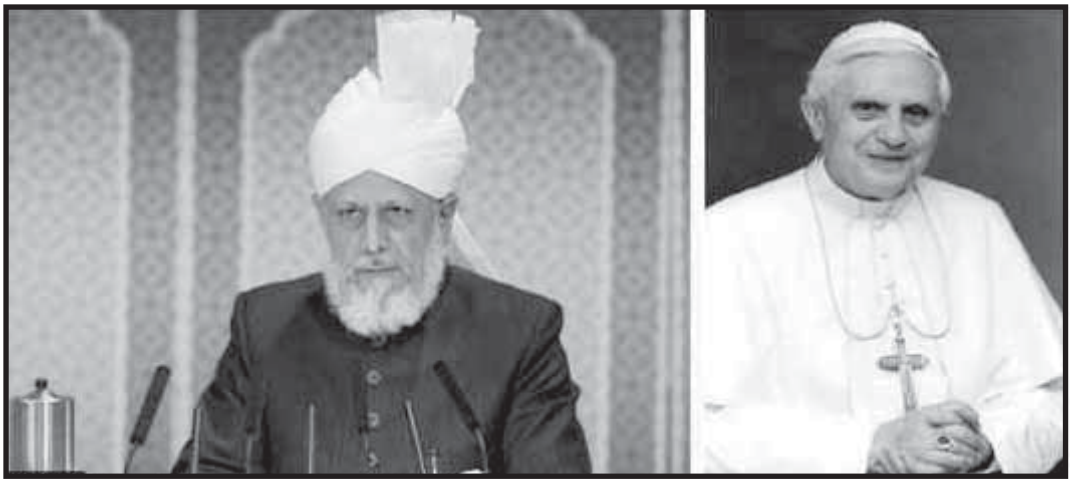

The Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad has sent a direct message to Pope Benedict XVI calling for the Pope to use his influence to encourage religious tolerance and the establishment of human values throughout the world.

The message was delivered personally by the President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Kababir, Muhammad Sharif Odeh, who met the Pope as part of an official delegation of renowned Israeli religious scholars.

In his message, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, spoke of the perilous state of the world. He said:

"It is with regret that if we now observe the current circumstances of the world closely, we find that the foundation for another world war has already been laid. As a consequence of so many countries having nuclear weapons, grudges and enmities are increasing and the world sits on the precipice of destruction.

I believe it is essential, that we urgently increase our efforts to save the world from this destruction. There is an urgent need for mankind to recognise its Creator as this is the only guarantor for the survival of humanity."

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad also said that the world should judge religions on their true teachings, not on the misguided acts of individuals or groups. He said:

"If a person does not follow a particular teaching properly whilst claiming to subscribe to it, then it is he who is in error, not the teaching.

From cover to cover, the Holy Qur'an teaches love, affection, peace, reconciliation and the spirit of sacrifice. Hence, if anybody portrays Islam as an extreme and violent religion filled with teachings of bloodshed, then such a portrayal has no link with the real Islam."

Speaking about the role of the Ahmadiyya Muslim Community, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

"The Ahmadiyya Muslim Community practises only the true Islam and works purely to please God Almighty. If any Church or other place of worship stands in need of protection, they will find us standing shoulder to shoulder with them. If any message resonates from our mosques it will only be that of Allah is great and that we bear witness that there is none worthy of worship except Him and Muhammad (peace be upon him) is the Messenger of Allah."

His Holiness concluded by praying for world peace and urging all other parties to play their respected roles for this all important pursuit. He said:

"It is my prayer that we all understand our responsibilities and play our role in establishing peace and love, and for the recognition of our Creator in the world. We ourselves have prayer, and we constantly beseech Allah that may this destruction of the world be avoided. I pray that we are saved from the destruction that awaits us."

Press Secretary AMJ International

Short URL of this page to share: www.alislam.org/e/1472

প্রেস রিলিজ **৬ ডিসেম্বর, ২০১১ইং**

পোপ বেনিডিক্ট এর কাছে বিশ্বমুসলিম নেতার শান্তির বার্তা প্রেরণ

বিশ্বের উচিত, তাদের সঠিক শিক্ষার ভিত্তিতে ধর্মসমূহের বিচার বিবেচনা করা

ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে এবং বিশ্বব্যাপী মানবসূলভ শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়ে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণ প্রিয় নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) পোপ বেনিডিক্ট-১৬ এর কাছে সরাসরি এক বার্তা পাঠিয়েছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কাবারির প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ শরীফ ওদেহ্, প্রখ্যাত ইসরায়েলী ধর্মীয় পন্ডিতগণের দাপ্তরিক প্রতিনিধির অংশ হিসেবে পোপ-এর সাথে দেখা করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে বার্তাটি হস্তান্তর করেন।

বার্তায় হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বর্তমান বিশ্বের বিপজ্জনক অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলেন, আক্ষেপের সাথে বলতে হয় যে, যদি আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষন করি, তাহলে দেখতে পাই যে, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়ে গেছে। অনেক দেশের পারমানবিক অস্ত্র থাকার পরিণতিতে পারস্পরিক ঈর্ষা ও শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্ব ধ্বংসের গিরিচূড়ায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, এটা অপরিহার্য যে, এ ধ্বংস থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে অতিশীঘ্র আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ বৃদ্ধি করা উচিত। সৃষ্টি কর্তাকে শনাক্ত করা মানবজাতির জন্যে খুবই জরুরী। কারণ তিনিই হলেন মানবতার টিকে থাকার একমাত্র জামিনদার"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন যে, কতিপয় লোক বা দলের ভুলভাবে চালিত কর্মের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং বিশ্বের উচিত, সঠিক শিক্ষার ভিত্তিতে ধর্মসমূহকে বিচার করে দেখা। তিনি (আই.) বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি কোন শিক্ষাকে যথাযথভাবে অনুসরণ না করে নিজেকে সেটার অনুসারী বলে দাবী করে, তাহলে সে-ব্যক্তিটি-ই ভ্রমে নিপতিত, ঐ শিক্ষাটি নহে।

পবিত্র কুরআন এর প্রত্যেক পৃষ্ঠা ভালবাসা, স্নেহ, শান্তি, সমন্বয় এবং ত্যাগের স্পৃহা শিক্ষা দেয়। এমতাবস্থায় ইসলামকে যদি কেউ রক্তপাতের শিক্ষা-পূর্ণ একটি চরম এবং হিংসাত্মক ধর্ম বলে বর্ণনা করে, তাহলে এ ধরনের বর্ণনার সাথে প্রকৃত ইসলামের কোন মিল নেই"।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "আহমদীয়া মুসলিম জামাত কেবলই প্রকৃত ইসলামের অনুশীলন করে, শুধু সর্বশক্তিমান খোদাকে খুশী করার উদ্দেশ্যেই কাজ করে। যদি কোন বার্তা অথবা অন্য কোন এবাদতের স্থান সংরক্ষিত হবার প্রয়োজন বোধ হয় তবে তারা আমাদেরকে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখবে। আমাদের মসজিদগুলো থেকে যদি কোন বার্তা ধ্বনিত হয়, তবে সেটা কেবল এ বার্তাই হবে যে, 'আল্লাহ্ মহান, এবং আমরা এ সাক্ষ্য বহন করি যে, তিনি (আল্লাহ্) ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ'।

হুযূর (আই.) বিশ্বের শান্তি কামনা এবং অন্যান্য দলগুলোকে এ কাজে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার উপর জোর দিয়ে বক্তৃতা শেষ করেন। তিনি (আই.) বলেন, "আমার প্রার্থনা হলো, আমরা সবাই যেন আমাদের দায়িত্বগুলো উপলব্ধি করি এবং শান্তি ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠায় এবং বিশ্বে আমাদের–সৃষ্টিকর্তাকে শনাক্ত করার কাজে ভূমিকা রাখি। আমরা নিজেরা দোয়া করি এবং আল্লাহ্‌র সমীপে অবিরতভাবে এ মিনতি করি, যাতে পৃথিবী এ ধ্বংস থেকে নিস্তার পায়। আমি দোয়া করি, আমরা যেন অপেক্ষমান ধ্বংস থেকে রক্ষা পাই"।

অনুবাদ : **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

দাজ্জাল ও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) প্রসঙ্গ

সরফরাজ এম, এ , সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

বিগত মাসিক মদীনা পত্রিকার সম্পাদকীয় এবং হাদীসে রাসূল (সা.) কলামে বলা হয়েছে যে, "বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা, বর্তমান শতাব্দীটাই দাজ্জাল আবির্ভাবের শতাব্দী। এর সুস্পষ্ট আলামত চারদিকে ফুটে উঠেছে। অপরদিকে দাজ্জালি ফেতনা থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করার লক্ষেই ইমাম মাহ্‌দীর মত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আবির্ভাব হবে। সুতরাং বর্তমান শতাব্দীটি যে খুবই ঘটনা বহুল ও গুরুত্বপূর্ণ হবে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং উম্মতের অভিভাবকের দায়িত্বপ্রাপ্ত আলেম-ওলামাগণের কর্তব্য হবে দৈনন্দিন পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকা।"

"মুসলিম উম্মাহর চরম সংকটের দিনে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটবে। তিনি হবেন মুসলিম বিশ্বের এমন এক অসাধারণ নেতৃ পুরুষ, যাঁর যোগ্য নেতৃত্বে মুসলীম উম্মাহ নতুন উদ্দীপনা এবং নতুন শক্তিতে জেগে উঠবে। তাঁর শাসনামলের শেষ পর্যায়ে সর্বপেক্ষা বড় বিপদ দাজ্জালের প্রদুর্ভাব ঘটবে। ভয়ংকর এই অপশক্তিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আ.)-কে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। তাঁর হাতেই দাজ্জাল নিহত হবে।"

মুখে মখে আল্লাহকে মানি, কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধানের পাশ কাটিয়ে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করি, এই প্রকার মনোবৃত্তি শুধু দুর্ভোগই ডেকে আনে, মুক্তির পথ দেখায় না। সারা বিশ্বই আজ খোদাদ্রোহীতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন ইসলামী উম্মাহ ও আজ সেই বিষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত নয়। অথচ কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে কোন অবস্থাতেই তোমরা কাফের মুশরিক ও অনাচারে লিপ্তদের অনুসরণ করো না।"

"উপমহাদেশের সর্বত্র জঙ্গীবাদের নতুন দানব সৃষ্টি করা হয়েছে। পর্যাপ্ত অর্থ দিয়ে অস্ত্রের যোগান এবং সাপোর্ট দিয়ে ইসলামের চিন্তা চেতনাকে চরমভাবে ঘায়েল করার ব্যবস্থা করো ফেলেছে দাজ্জালের এই অগ্রসৈনিকেরা। এই পরিস্থিতি নি:সন্দেহে মুসলিম উম্মাহর জন্য চরম হতাশাজনক।"

ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রচারমূলক ধর্ম। পবিত্র কুরআন মুসলমান জাতির পক্ষে প্রদর্শক মহাগ্রন্থ। এই কুরআন মুসলমান জাতির ঘরে ঘরে বিরাজমান, দৈনন্দিন পঠিত হয়। মুখস্ত করা হয়। নায়েবে রাসূলের দাবীদার আলেম ওলামা মুফতি মওলানা সাহেবানদের সংখ্যা কমে যায় নি কোন অংশে, বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে এতদসত্বেও মুসলমান জাতি আজ অধ:পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাওয়ার প্রকৃত কারণ কি? এত আলেম ওলেমা পীর মুর্শিদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদ, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরগণ থাকতে আবার ইমাম মাহ্‌দীর প্রয়োজনটা কি? নিশ্চয় তার মিথ্যা, ভুল মত ও পথে বিশ্বাসী হয়ে পথহারা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে নিজেরা বিপথগামী হবে এবং সাধারণ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করবে। এই অবস্থায় যখন তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথ দেখাবার জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন হবে, তখন তাঁর কথাও কেউ কানেই তুলতে চাইবে না বরং অজনা, অদ্ভুত, উল্টা ও নতুন কথা ভেবে ধর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে কোমর বেঁধে লাগবে। ইসলামের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী প্রমাণ বহন করে চলছে। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত এটাই হয়ে আসছে। হাদীসগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, "বহু টুপীধারী ব্যক্তি দাজ্জালের অনুসরণ করে চলবে।"

পবিত্র কুরআন তাদের অন্ধ বোবা, বধির এবং মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দেখবে না, শুনবে না, জানবে না, বুঝবে না। এই রূপ অন্ধ, বোবা এবং বধির হয়ে যাওয়ার কারণেই ত্রিত্ববাদী যে, ইসলামের চির শত্রু খৃষ্টানগণই দাজ্জাল, তা তারা দেখতে পারছে না, তাদের কার্যকলাপ বুঝতে পারছে না, জানতেও পারছে না। যরা সত্যকে মিথ্যা বানায় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে, যারা বলে খোদা এক পুত্র গ্রহণ করেছে, (নাউযুবিল্লাহ্) খোদা একজন নহে, তিনজন। খোদা এক খোদা, মরিয়ম এক খোদা, মরিয়ম পুত্র যীশু এক খোদা। তিনে এক একে তিন। খোদার পুত্র যীশু হয়ে আসমানে খোদার ডান পাশে বসে আছেন। আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে জগত জয় করবেন ইত্যাদি।

চর্ম চক্ষু তাদের অন্ধ নয়। অন্তর চক্ষু অন্ধ, যা বক্ষে আছে। এই অন্ধত্বের কারণেই তারা দাজ্জালের চক্রান্ত জানতেও পারছে না, বুঝতেও পারছে না, দেখতেও পারছে না। এইরূপ না জানা না বুঝা এবং দেখতে না পারার কারণেই তারা দাজ্জালের পাতা ফাঁদে আটকে গিয়ে জড়িত হয়ে দাজ্জালেরই দেখানো এবং শেখানো পথে আজ তারা চলছে। ত্রিত্ববাদী দাজ্জালের বিশ্বাস যেমন যীশু (ঈসা আ.) আসমানে খোদার নিকট অবস্থান করছেন, আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে জগত জয় করবেন, তদ্রুপ মুসলমান জাতির নায়েবে রাসূলের দাবীদার আলেম ওলেমা মুফতি মওলানা নামধারীগণের বিশ্বাস খৃষ্টানদের নবী হযরত ঈসা (আ.) আসমানে আল্লাহ্ তাআলার নিকটে অবস্থান করছেন। আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে মুসলমান জাতিকে দাজ্জালের কবল থেকে উদ্ধার করবেন।

বিশ্বাসের দিক দিয়ে ত্রিত্ববাদী দাজ্জাল নামক খৃষ্টানগণ এবং মুসলমান জাতির নায়েবে রাসূলের দাবীদার আলেম ওলেমা মুফতি মওলানাগণ একই পথের যাত্রী হয়ে মানবকূল শ্রেষ্ঠ শিরোমণি হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র বাণী, "বহু টুপীধারী ব্যক্তি দাজ্জালের অনুসরণ করবে।" অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে।

মুসলমান জাতির অভিভাবকের দাবীদার আলেম ওলেমা মুফতি মওলানাগণ ত্রিত্ববাদী দাজ্জালের খপ্পরে পতিত হয়ে ঘুমের ঘরে অচেতন। তাদের হুস হয়নি যে, পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলার কঠোর

নির্দেশ, "তোমরা কোন অবস্থাতেই কাফের মুশরিকদেরকে অনুসরন করবে না।" অন্তর চক্ষু অন্ধ। চর্মচক্ষুতে দেখে বিচার বিশ্লেষণ করার কারণেই অনুসরণ বলতে কোট প্যান্ট টাই ইত্যাদি নিজেরা বুঝেন এবং সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে থাকেন। একটু ভেবে দেখে না যে, পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে ধর্ম থাকে না। ধর্ম থাকে মানুষের অন্তর প্রদেশে বিশ্বাসে। পোশাক পরিচ্ছদ মানুষ কেন পরিধান করে? মাত্র তিনটি কারণে। লজ্জা নিবারণ, শীততাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। তা না হলে পোশাক পরিচ্ছদের কোন প্রয়োজন ছিল কি? আলেম ওলেমা মওলানা মুফতিগণ হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর আদর্শ শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে পোশাব পরিচ্ছেদের মধ্যে তাঁর আদর্শকে সীমাবদ্ধ করে, আর এই অন্ধত্বের কারণেই মুসলমান জাতির আজ এহেন চরম অধঃপতন। হযরত রাসূল করীম (সা.) কি ধরনের টুপী ব্যবহার করতেন, লম্বা কি না গোল, জুব্বা কতটুকু লম্বা ছিল, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কিনা ইত্যাদি চিন্তা ভাবনা করতেই তাদের সময় ফুরিয়ে যায়, অন্যান্য চিন্তা ভাবনার সময় কোথায়।?

পবিত্র কুরআন মুসলমান জাতির পথ-প্রদর্শক, কিন্তু কাদের জন্য পথ প্রদর্শক? এই কেতাবের সর্বপ্রথমেই বলা হয়েছে, এই কেতাব মু'মিন মুত্তাকির জন্য পথ-প্রদর্শক। মু'মিন মুত্তাকি হওয়ার শর্ত আরোপ করে পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "যারা তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে এবং আল্লাহ্‌র 'রজ্জুকে' শক্তভাবে ধরবে আর শুধু আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে তারাই হবে মু'মিন মুত্তাকিগণের অন্তর্ভুক্ত, এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই মু'মিন মুত্তাকিগণকে মহাপুরস্কার দিবেন।" (সূরা নিসা) 'রজ্জু' সূরা নূরে বর্ণিত খিলাফত। যারা প্রকৃত মু'মিন মুত্তাকি তাদের খিলাফত থাকবে। যার মাধ্যমে একতা ভ্রাতৃত্ববোধ ও পরস্পর স্নেহ মহব্বতের বন্ধন দৃঢ় থাকবে। মু'মিন মুত্তাকিগণের খিলাফত থাকবে একথা বিজ্ঞ আলেম ওলেমাগণও স্বীকার করেন। "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের খিলাফত দিয়েছিলেন, এবং তাদের জন্য তাদের এই দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় কারিয়ে দেবেন, যা আল্লাহ্ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে, আমার সাথে কাউকেই শরীক করবে না।" (সূরা আন নূর : ৫৫) (মাসিক মদীনা)

"এতো একটি উপদেশ-সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। আর অতি অল্পকালে পরেই এর (সত্যের) সংবাদ ঘটনা সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে।" (সূরা সাদ) এ ধরনের আয়াত সমূহ মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আরো বহু আয়াত আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের, প্রেরীত নবী রাসূলের অনুসারীগণকে সুসংবাদ দিচ্ছে। আরো সুসংবাদ দিচ্ছে অসত্যের উপর বিজয় এবং যারা আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্য সম্পর্কে।

"আর যাবুর কিতাবে নসীহতের পর আমরা লিখে দিয়েছি যে, আমার নেক বান্দাগণ জামানার উত্তরাধিকারী হবে।" (সূরা আম্বিয়া) "আল্লাহ্ লিখে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আমি এবং আমার রাসূলগণই বিজয়ী হবো।" (সূরা মুযাদালা) "বরং আমরা তো বাতিলের উপর সত্যের দ্বারা আঘাত হেনে থাকি, যা বাতিলের মাথা চুর্ণবিচুর্ণ করে দেয়। অতঃপর তা দেখতে দেখতে বিলুপ্ত হয়ে যায়।" (সূরা আম্বিয়া) "বল সত্য এসে গেছে এবং বাতিল আর প্রবর্তিত হবে না এবং বাতিলকে ফেরতও আনা যাবে না।" (সূরা সাবা) "নিশ্চিতভাবে কেবল আল্লাহ্‌র দলই জয়ী হবে।" (সূরা মায়েদা) "অতএব ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহ্‌র ওয়াদা নিশ্চিতভাবেই সত্য।" (সূরা মুমিন)

ঈমান ও আমল খাঁটি মুসলমান হওয়ার লক্ষণ। আমল না থাকলে ঈমানের যেমন অনন্ত মরুভূমিতে বৃক্ষ রোপন করতঃ ভাল সেঞ্চন না করার ন্যায় অর্থহীন। ঈমানহীন আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। মুসলমানগণ নামায পড়ে রোযা রাখে তবুও এই জাতির অধঃপতন কেন, ঈমানহীন আমলের কারণে নয় কি?

এই অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী নেতা বিহীন, ঈমানহীন দলও উপদলে শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমান জাতির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি ও জগতগুরু হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমান জাতিকে ঐক্যের ডাক দিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মাধ্যমে পুনরায় পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করলেন।

প্রচার শক্তিই ধর্মের প্রাণ। যে ধর্মের প্রচার কার্য নেই সে ধর্ম প্রাণহীন দেহের তুল্য। হযরত রাসূল করীম (সা.) ইসলাম বা শান্তির ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কিন্তু প্রচার কার্য দ্বারা বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এনে যেতে পারেন নি। হুযূর (সা.) এর অন্তর্ধানের পর এই গুরু দায়িত্ব ছিল নায়েবে রাসূলের দাবীদার আলেম ওলেমা মুফতি মওলানাগণের স্কন্ধে। আলেম ওলেমা মুফতি, মাওলানাগণ পথ ভ্রষ্ট ত্রিত্ববাদী দাজ্জালের ফাঁদে পতিত হয়ে ইসলাম প্রচারের দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অচেতন অবস্থায় স্বপ্ন দেখছেন, মরে গিয়ে কে কয়টা পরমা সুন্দরী হুরী লাভ করতে পারবেন।

দুনিয়াদারীর লোভ লালসা, কামনা বাসনার মদমত্তে নিমগ্ন হয়ে নিজ নিজ এবং দলগত স্বার্থে ধর্মকে হাতিয়ার বানিয়ে অভ্যান্তরীণ দ্বন্দ্ব কলহ হিংসা বিদ্বেষ দলাদলি, রেষা রেষি, মারা মারি, খুনা খুনিতে মত্ত হয়ে, কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় এমন কি প্রচার করে বিবি তালাক হয়ে গেল ইত্যাদি ফতুয়া দ্বারা সমাজের খেদমত করতে করতেই সময় ফুরায়ে যায়। ইসলাম প্রচারের সময়টা কখন?

"ধর্মীয় তথা মাযহাবী মত বিরোধ ইসলামের বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে। অনেক ক্ষেত্রে মাযহাবী মত পার্থক্যকে অনেক বড় করে দেখানো হচ্ছে। কখনও কখনও এর পরিণতিতে একে অপরকে কাফের বা ফাসেক সাব্যস্ত করছে। মুসলমানরা একে অপরের ভাই হওয়া সত্বেও কোথাও কোথাও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায়। নিঃসন্দেহে এটা চরম অন্যায়। এর চেয়ে বড় অন্যায় হচ্ছে কুরআন মজিদের নির্দেশ অমান্য করা।"

(মাসিক মদীনা)। আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসার কল্পে বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আহমদ নামানুসারে আহমদী জামাত প্রতিষ্ঠা করলেন। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রচারকগণই ধন জন এবং জীবন যোগে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে দিবানিশি নিমগ্ন। তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের ফলে ইহুদী খৃষ্টানও অন্যান্য জাতির মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছে। সেদিন অতি সন্নিকট। বেশী আর দেরী নয় যেদিন বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বিজয় পতাকা পত্ পত্ করে উড়বে।

প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতায় হাজারো নিদর্শন

-মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু

পাবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে :
আর তাদের কাছে প্রথম কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, আল্লাহ্‌র রাসূলদের যেরূপ (নিদর্শন) দেয়া হয়েছিল তেমনটি আমাদের না দেয়া পর্যন্ত 'আমরা কখনো ঈমান আনবো না'। আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন তিনি তাঁর রিসালত (কে তাঁর নবী হবার উপযুক্ত নহে) কোথায় অর্পন করবেন। যারা অপরাধ করেছেন তাদের ষড়যন্ত্রের দরুন তাদের ওপর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও কঠোর আযাব নেমে আসে (সূরা আল্ আন্ আম)।
আখেরী যুগে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ দাবীদার ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। হাদীস শরীফে আছে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) (বিপাশা) বিয়াস নদীর নিকটস্থানে জন্ম নিবেন যা কাদিয়ান হতে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বড় জমিদার বংশীয় হবেন। আবু দাউদ শরীফের হাদীস মোতাবেক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) শেষ যুগের আগমনকারী মহাপুরুষ হিসেবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ লাভ করে মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ দাবী করেছেন। তাঁর দাবীর পক্ষে কুরআন সাক্ষ্য বহন করছে, যুগের চাহিদা সাক্ষ্য বহন করছে, যুগের লক্ষণাবলী সাক্ষ্য বহন করছে, পৃথিবীর ধর্মীয় সম্প্রদায় এর অবস্থাও সাক্ষ্য বহন করছে, সমাজ ব্যবস্থাও সাক্ষ্য বহন করছে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে খতিয়ে দেখলে জ্ঞানীগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, সমস্ত কিছুই শেষ যুগে আগমনকারী ব্যক্তির জন্য এক একটি সাক্ষ্য স্বরূপ।
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবীকারক মহাপুরুষ তাঁর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ সহস্র সহস্র নিদর্শনাবলী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ করে দুনিয়ার মানুষের বিবেকের কাঠ গড়ায় পেশ করেছেন এর উদ্দেশ্য হল মানবজাতি যেন তাঁকে চিনে বুঝে গ্রহণ করে আল্লাহ্ ও প্রিয় রাসূল (সা.)-এর মান্যকারীতে পরিণত হয়। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তা পূর্ণ হয়ে যায়, তিনি তো যাদুকর নয়, আর খোদা তাআলার ইচ্ছা যখন তাঁর প্রকৃত দাসদের উপর প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর সকল ইচ্ছাই খোদা তাআলার ইচ্ছাতে পরিণত হয়। এই প্রবন্ধে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) হবার দাবীদার, মহানবী (সা.) প্রকৃত প্রেমিক ও গোলাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর কতিপয় নিদর্শনের উল্লেখ করতে যাচ্ছি যাতে পাঠকগণ অবগত হন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবীদার যা বলেন তা পূর্ণ হয়।
১নং নিদর্শন : আবু দাউদ শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভোগে এই উম্মতের জন্য এক ব্যক্তি প্রত্যাদিষ্ট হবেন, সে মোতাবেক হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। এই হাদীসের সমর্থনে তাঁর দাবীর পর আর কেউই দাবীর আওয়াজ উঠায়নি।
২নং নিদর্শন : সহী দারকুতনীতে ইমাম বাকের বলেন, ইমাম মাহ্‌দীর জন্য আসমানে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন দেখানো হবে, মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবীর পরে বিরোধীদের দাবীর মুকাবেলায় আল্লাহ্ থেকে জেনে তিনি বলেন গ্রহণ হবে তোমরা অপেক্ষা কর, সে মোতাবেক ১৯৮৪ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে (যথাক্রমে) পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে তা সংঘটিত হয়েছে।
৩নং নিদর্শন : হাদীস মোতাবেক আকাশে গুচ্ছ বিশিষ্ট তারকার উদয় হওয়ার কথা ছিল, তা উদয় হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন পত্রিকাতে তা প্রকাশ করা হয়।
৪নং নিদর্শন : "ওয়া ইযাল ইশারু উত্তেলাত" (সূরা আত্ তাকভীর) মোতাবেক ও হাদীস অনুযায়ী মসীহ্ও মাহ্‌দীর যুগে নতুন নতুন যান বাহন উদ্ভাবন হবার কথা তাও ব্যাপকাকারে উদ্ভাবন হয়েছে।
৫নং নিদর্শন : ইমাম মাহ্‌দীর যুগে হজ্জ ব্রত বন্ধ হওয়ার নিদর্শণ পূর্ণ হয়েছে ১৮৯৯ ও ১৯০০ সালে প্লেগের দরুন হজ্জ বন্ধ ছিল, তাতেও শেষ যুগের মাহ্‌দীর সত্যতার প্রমাণ হয়।
৬নং নিদর্শন : "ওয়া ইযাস্‌সুহুফু নুশিয়াত' আয়াত অনুযায়ী ও হাদীস মোতাবেক মাহ্‌দীর যুগে পুস্তক-পুস্তিকা ও ছাপাখানার ব্যাপক বিস্তৃত করা হবে, এ যুগে তার প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।
৭নং নিদর্শন : 'ওয়া ইযাল বিহারু সুজ্‌জিরাত' কুরআনী আয়াত অনুযায়ী ও হাদীস মোতাবেক মাহ্‌দীর যুগে বিপুল পরিমাণে খাল খনন করা হবে তা হয়েছে এবং হচ্ছে।
৮নং নিদর্শন: 'ওয়া ইযাল নুফুসু যুয়্যাযাত' কুরআনী আয়াত অনুযায়ী ও হাদীসেও আছে, যখন বিভিন্ন জাতির লোকদেরকে সমবেত করা হবে, এই মোতাবেক মাহ্‌দীর যুগ কি গত শোয়াষো বছর আগে শুরু হয়নি? অবশ্য তা হয়েছে যার চোখ আছে সে দেখুক।
৯নং নিদর্শন : কুরআনী আয়াত অনুযায়ী ও হাদীসে আছে, যখন কম্পনশীল পৃথিবী কম্পমান হবে আর একটি পাশ্চাদবর্তী কম্পন এর অনুসরণ করবে, মোতাবেক মাহদীর যুগে ঘন ঘন ভূমিকম্প দেখা দিয়ছে ও দিচ্ছে, সমস্ত কিছু হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) পৃথিবীবাসীকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন,"আমি না আসলে এ সমস্ত বিপদ আসতে আরো দেরি হত।
১০নং নিদর্শন : হযরত মির্যা সাহেব (আ.) বললেন, এ যুগে আমার আগমন হওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের বিপদ দ্বারা বিপুল সংখ্যায় মানুষ ধ্বংস হবে, প্লেগ দ্বারা, ভূমিকম্প দ্বারা, তুফান, আগ্নেয়গিরি, যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা ইত্যাদি। দুনিয়া আমাকে কবুল করেনি, তাই এসব হয়েছে এবং হচ্ছে।
১১নং নিদর্শন : দানিয়াল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তিনি দাবী করেছেন এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। যার নির্ধারিত সময় মোতাবেক তিনি আগমন করেছেন।
১২নং নিদর্শন : শেষ যুগে আগমনকারী ঈসা মসীহের যুগে ভূমিকম্প ও প্লেগের ভবিষ্যদ্বাণী, সেই যুগের মত জাহের হবে যা ঈসা ইবনে মরিয়মের যুগে হয়েছিল। সে যুগের নথি দেখুন তাই হয়েছে।
১৩নং নিদর্শন : বাইবেলে আছে ষষ্ঠ হাজার বৎসরের শেষে প্রতিশ্রুত মসীহের জাহের হবে, সেই মোতাবেক শেষ যুগের দাবীকারক দাবী করেছেন।
১৪নং নিদর্শন : শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষ সম্পর্কে নেয়ামত উল্লাহ্ ওলীর

ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে। নেশানে আসমানী বইয়ে বিস্তারিত বলা আছে।

১৫নং নিদর্শন : শেষ যুগে আগমনকারী মাহ্‌দী (আ.) সম্পর্কে গোলাবশাহ জামালপুরীর ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে, যার আলোচনা দাবীকারকের এযলায়ে আওহাম বইয়ে বিস্তারিত বলা আছে।

১৬নং নিদর্শন : পীর সাহেবুল আলাম সিন্ধী অতি খ্যাতিমান বুযুর্গ তিনি স্বপ্নে আঁ হুযূর (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি (সা.) বলেন, মির্যা সাহেব (আ.) সত্যবাদী, যা মির্যা সাহেবের বই তোহফায়ে গুলড়াবিয়ায় বিস্তারিত লেখা আছে।

১৭ নং নিদর্শন : আফগানে সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ শহীদের প্রতি ইলহাম, কাদিয়ানে দাবীদার ব্যক্তি সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্।

১৮নং নিদর্শন : সূরা আল হাক্কার ৪৫-৪৭ আয়াত মোতাবেক কোন মিথ্যা দাবীকারককে আল্লাহ্ দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখে না। কিন্তু মির্যা সাহেব দাবীর পর ২৭ বছর জীবিত থাকলেন এবং আজ তাঁর জামা'ত, সজীব ও সমস্ত পৃথিবীতে ছেয়ে গেছে। উক্ত বাণীতে তিনি নিজে সত্য বাদী দাবী করে চ্যালেঞ্জ ছুরছেন।

১৯নং দিনর্শন : ভাওয়ালপুর নিবাসী নবাবের পীর খাজা গোলাম ফরিদ সাহেব তাঁর লিখিত রচনাবলীতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্যায়ন করেন যা তিনি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবহিত হন। উক্ত পীর সাহব অত্যন্ত পবিত্র ছিলেন যুগের দিকে থেকে।

২০নং নিদর্শন : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেন, আমি প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ইলহাম পাই 'তুমি এক দূরবর্তী বংশকে দেখবে, তিনি (আ.) নিজেই বলেন, আমি আমার সন্তান সম্পর্কে এই ইলহাম লাভ করেছি।

২১নং নিদর্শন : হযরত ইমাম মাহ্‌দীর দাবীদার তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ আমাকে আমার পিতা সম্পর্কে ইলহাম করেন, আমি বুঝতে পারলাম আমার পিতার বিয়োগ ঘটবে, সকলকে এই ইলহাম জানানো হয়, তাও পূর্ণ হয়।

২২নং নিদর্শন : আমার পিতার মৃত্যুর পর সকল দিক থেকে আমার উপরে সমস্যা নেমে আসলো, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে ইলহাম করে বললেন, "আলাই সাল্লাহু বে কাফিন আবদাহু" অর্থাৎ খোদা কি নিজ বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? মোতাবেক খোদা আমার সকল ক্ষেত্রে অভিভাবক হয়ে গেলেন।

২৩নং নিদর্শন : ডিপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম নামে এক ব্যক্তি সব সময় আঁ হযরত (সা.)-কে দাজ্জাল, কাজ্জাব বলতো, আমি ১ম বার বললাম সে পনর মাসের মধ্যে মারা যাবে, ২য়টিতে বললাম সে যদি তার কথা থেকে বিরত হয় তাহলে হিসাব খোদার কাছে, সে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বলা থেকে বিরত হল এবং পনর মাসের মধ্যে মৃত্যু থেকে বেঁচে গেল বটে কিন্তু কয়েক মাস পরে সে মৃত্যু কোলে ঢোলে পরলো। (পরবর্তী ১৫ মাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হল)

২৪নং নিদর্শন : ১৮৯৯ সালের ৩০ জুন আমার নিকট ইলহাম হল, যার মধ্যে আমার জামা'তের কোন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মৃত্যুর উল্লেখ ছিল। আমি আল্ হাকাম পত্রিকায় তা ছাপিয়ে দিলাম। অবশেষে জুলাই মাসে বন্ধু এ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জন ডাক্তার মুহাম্মদ বুড়ি খান মারা গেল।

২৫নং নিদর্শন : আমার পুস্তক মোয়াহেবুর রহমানের ১২৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হয় আল্লাহ্ আমাকে নির্দোষের ইলহাম করে জানান, তা পূর্ণ হল।

২৬নং নিদর্শন : করমদীন আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা করেন, আল্লাহ্‌র ফজলে আমাকে গুরুদাসপুর কোর্টে চান্দুলাল ও আত্মারাম ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আমি রেহাই পাই, যা পূর্বে আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছিলেন যে তুমি রেহাই পাবে।

২৭নং দিনর্শন : করমদীন ঝিলামীর শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ আমাকে ইলহাম করে জানান আমি সকল মানুষকে পূর্বেই অবহিত করি এবং কমরদীন শাস্তি পেল।

২৮নং দিনর্শন : ম্যাজিষ্ট্রেট আত্মারামের সন্তানের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা পূর্ণ হল।

২৯নং দিনর্শন : একষ্ট্রা সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট লালা চান্দুলালের পদাবনতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তাও আল্লাহ্ পূর্ণ কররেন, পরে তিনি মুলতানের মুনসেফ পদে বদলী হন।

৩০নং দিনর্শন : আমেরিকার ডুই নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তাকেও আল্লাহ্ লাঞ্ছনার সাথে শাস্তি দিলেন, আল্লাহ্ আমাকে সম্মানিত করলেন।

৩১নং নিদর্শন : ডাক্তার মার্টিন ক্লার্কের মিথ্যা মোকদ্দমা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, আল্লাহ্ আমাকে খুনের মোকদ্দমা হতে রক্ষা করে সম্মান বৃদ্ধি করলেন।

৩২নং নিদর্শন : আমার বিরুদ্ধে ট্যাক্স সম্পর্কে মিথ্যা মোকদ্দমা করা হয়েছিল, আল্লাহ্ আমাকে জানালেন তুমি নির্দোষ প্রমাণিত হবে। আর আল্লাহ্ আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করলেন।

৩৩নং নিদর্শন : মি: ডুই গুরুদাসপুর কোর্টে মিথ্যা ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছিল, আল্লাহ্ আমাকে ইলহামে জানান তুমি নির্দোষ প্রমাণিত হবে, আল্লাহ্ আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করলেন। ঐ সময় যারা উপস্থিত ছিল তারা সকলেই অবগত আছেন।

৩৪নং নিদর্শন : আমার একটি ছেলে মারা গেলে বিরোধীরা ঝড় তুলেছিল আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ আমাকে জানান যে এর বিনিময়ে শীঘ্রই একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ হবে, আর ৭০ দিন পার না হতে মাহমুদ আহমুদের জন্ম হল।

৩৫নং নিদর্শন : এর পরে বিরুদ্ধবাদীদের উল্লাসের প্রেক্ষিতে আর এক ছেলে বশীর আহমদের জন্ম হল, যার সংবাদ পূর্বেই ছাপানো হয়েছিল।

৩৬নং নিদর্শন : বিরুদ্ধবাদীদের উপহাসের মুকাবিলায় আর এক পুত্র সন্তান সম্পর্কে শুভ সংবাদ দেন যা সকলকে জানানো হয় সে ছেলের নাম শরীফ আহমদ।

৩৭ নং নিদর্শন : আল্লাহ্ এরপর আমাকে এক কন্যা সন্তান সম্পর্কে শুভসংবাদ দান করেন সে সংবাদও সকলকে জানানো হয় সে মোতাবেক কন্যা জন্ম হল নাম তাঁর মোবারেকা বেগম।

৩৮নং দিনর্শন : মেয়ের পর আল্লাহ্ আবারও এক পুত্র সন্তানের শুভসংবাদ দিলেন আমি সকলকে জানিয়েছিলাম সে মোতাবেক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁর নাম মোবারক আহমদ।

৩৯নং নিদর্শন : খোদার ওহী দ্বারা আবার জানালেন আর একটি মেয়ের জন্ম হবে, আমি আমার বরাবরের রীতি অনুযায়ী সকলকে জানিয়ে দিলাম সে অনুযায়ী মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন, নাম আমাতুল হাফিজ।

৪০নং দিনর্শন : খোদার পক্ষ থেকে ওহী দ্বারা জানানো হল আর একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ এবং সে মারা যাবে, সে মোতাবেক সে কয়েক মাস পরে মারা গেল।

৪১নং দিনর্শন : আমার পুস্তক মোয়াহেবুর রহমানের ১৩৯নং পৃষ্ঠায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে আল্লাহ্ আমাকে ৪টি ছেলে সন্তান দিবেন সে মোতাবেক আল্লাহ্ মাহমুদ আহমদ, বশীর আহমদ, শরীফ আহমদও মোবারক আহমদ এর জন্ম হয়। তাদের দীর্ঘায়ূ সম্পর্কে ও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

৪২নং নিদর্শন : আল্লাহ্ আমাকে পৌত্রের রূপে পঞ্চম ছেলের শুভ সংবাদ দেন, ভবিষ্যদ্বাণীতে তার নাম নাসের আহমদ রাখা হয়েছে, তাও তিন মাস পরে মাহমুদ আহমদের ঘরে জন্ম নিল।

(চলবে)

মসজিদে হাশেম-এ কিছুক্ষণ

মাহমুদ আহমদ সুমন

বেশ অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে হচ্ছিল নাটোর জেলার তেবাড়ীয়ার নির্মানাধীন দ্বিতল মসজিদটি দেখার। মনে মনে ভাবছিলাম কখন সুযোগ হবে। কিন্তু সময়-সুযোগের অভাবে সম্ভবই হচ্ছিল না। ঠিক করলাম মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের যদি অনুমতি পাই তাহলে এবার ঈদুল আযহার দু'দিন পর নিজ বাড়ী পঞ্চগড়ে যাওয়ার পথে নাটোর হয়ে যাব। পবিত্র ঈদুল আযহার দু'দিন পরে বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি চাইলে শ্রদ্ধেয় ন্যাশনাল আমীর সাহেব সদয় অনুমতি প্রদান করেন, যাযাকুমুল্লাহ।

নাটোরে যেহেতু কোন দিন যাই নাই তাই প্রথমে ভেবেছিলাম কিভাবে যাব। ফোন দিলাম ছোট বোন জামাইয়ের কাছে। তিনি সুন্দরভাবে সব কিছু বলে দিলেন। কল্যাণপুর থেকে ৯ নভেম্বর রাত ১২টার হানিফ বাসের টিকেট করলাম। বাস যথাসময়ে তার নির্ধারিত সময়ে যাত্রা করলো।

রাত প্রায় ৩:৩০ টার নাটোর বাস ষ্ট্যান্ডে আমাকে নামিয়ে দিল। বাস থেকে নামা মাত্রই শীতের আভাস গায়ে অনুভব হতে লাগলো। তখনো ফজরের আযান হয়নি। ভাবছি অজানা শহর, গভীর রাত, আমি একা, আবার ছোট বোন লাকীকে এতো রাতে ফোন দিয়ে ঘুম ভাঙ্গাবো তাও মন সায় দিচ্ছে না। তাই নীরবে দোয়াই করছিলাম।

কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে ভোরের অপেক্ষা করতে আর হলো না বোন জামাই নিজেই ফোন দিয়ে তাদের বাসায় নেয়ার ব্যবস্থা করলেন। বাসায় গিয়ে কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে নাস্তার পর্ব সেরে বোন জামাইকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম তেবাড়ীয়ার 'মসজিদে হাশেম' দর্শন এবং সেখানকার আহমদী পরিবারগুলোর সাথে কিছুক্ষণ কাটানোর জন্য। তেবাড়ীয়া জামাতের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব মহসীন আলী রেজা সাহেব আমাকে দেখা মাত্রই আনন্দের সাথে ঘরে নিয়ে বসালেন। তেবাড়ীয়ায় আহমদীয়াতের ইতিহাস ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন এবং নাস্তা করালেন। যোহর নামাজ আদায় করি মসজিদে হাশেমে। বাদ যোহর কয়েকজন প্রবীণ আহমদীর কাছে তেবাড়ীয়ার আহমদীয়াত, মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং যাদের ত্যাগের ফলে আজ যে বিশাল মসজিদ নির্মিত হচ্ছে তার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হয়।

আলোচনার মাধ্যমে তেবাড়ীয়ায় জামাত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত চিত্র ফুটে উঠে। বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ জমিদার ও ধার্মিক ব্যক্তি জনাব আব্দুর রহিম খান চৌধুরী সাহেবের প্রথম সন্তান জনাব খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী। তাঁর মাতাও ছিলেন ধর্ম পরায়ণা বিদুষী মহিলা। নাটোর তেবাড়ীয়ায় আহমদীয়াতের বীজ যার মাধ্যমে রোপীত হয় তিনি হচ্ছেন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব। এই মহান ব্যক্তি ১৮৮৩ সালে নাটোরের বিখ্যাত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১০ সালে লেখাপড়া শেষে কর্মময় জীবন শুরু করেন।

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন ১৯১৫ সালের গোড়ার দিকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর হাতে।

জনাব আব্দুর রহিম খান সাহেব-এর তিন ছেলে। প্রথম সন্তান হলেন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী। দ্বিতীয় সন্তান হলেন আবুল কাসেম খাঁন চৌধুরী আর তৃতীয় সন্তান হলেন আবুল আসেম খাঁন চৌধুরী।

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব যখন ১৯১৫ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করলেন তিনি ভাবতে লাগলেন আহমদীয়াতের অতুলনীয় সুন্দর শিক্ষা কিভাবে এ এলাকায় ছড়ানো যায়। তাই তিনি প্রথমে নিজ বাড়ীতেই আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছানোর চিন্তা করলেন। তাঁর মুখে আহমদীয়াতের উন্নত শিক্ষা এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের বার্তা শুনে উনার বড় দু' ভাই দ্বিতীয় জনাব আবুল কাশেম খান চৌধুরী এবং জনাব আবুল আসেম খান চৌধুরী বয়আত গ্রহণে পিছপা হন নি।

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব দীর্ঘ দিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়ীত্ব পালন করেন।

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব-এর ভাই আবুল কাসেম খান চৌধুরীর নেক ও যোগ্য সন্তান হলেন মরহুম ডাক্তার আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব। আমাদের জামাতে যাকে গরীবের বন্ধু ও দানবীর হিসেবে অনেকে এক নামে চেনেন। ডাক্তার আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব পরবর্তিতে বাংলাদেশ জামাতের নায়েব আমীর পদে আসীন হয়ে ছিলেন। উনার সহধর্মিনী বেগম মাসুদা সামাদ সাহেবা সবার মাঝে এতই জন প্রিয় ছিলেন যে, নাটোরের আহমদীগণ উনাকে স্নেহময়ী মাতা মনে করতেন। আর তিনি সব সময় সব আহমদীর খোঁজ-খবর নিতেন, কারো কোন সমস্যা থাকলে তিনি চেষ্টা করতেন সমস্যা মুক্ত করার। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর হিসেবেও নিষ্ঠার সাথে দায়ীত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এই পরিবারের আরেকজন কৃতি সন্তান হচ্ছেন খান বাহাদুর সাহেবের পুত্র মরহুম আবুল কাসেম খান চৌধুরী (আনসারী ভাই বলে সমধিক পরিচিত)। তিনি শৈশবে কাদিয়ানে সাহাবীদের সাহচর্যে থেকে লেখাপড়া করেন।

জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি জামাতের সেবায় নিবেদিত ছিলেন এবং বাংলাদেশ জামাতের নায়েব আমীরের দায়িত্বও পালন করেছেন। তাঁর পরিবারের সকলেই বর্তমান জামাতের সেবায় নিয়োজিত আছেন।

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব এর তৃতীয় ভাই জনাব আবুল আসেম খান চৌধুরী সাহেব। যিনি নাটোরের আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এমনকি অত্র অঞ্চলে তবলীগের সময় বিরোধীরা (বগুড়াতে) তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দিয়েছিল। তিনি তাঁর বুকে লাল কালি দিয়ে বড় অক্ষরে লিখেছিলেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রচারের জন্য মাইলের পর মাইল পায়ে হাটতেন এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন তা প্রচার করতেন। তার এই প্রচেষ্টা আল্লাহ্ তাআলার ফজলে সার্থক হয়েছে।

১৯৫৩ সাল থেকে চৌধুরী বাড়িতেই বা-জামাত নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং এখান থেকেই নাটোর জামাতের কার্যক্রম চলতো । এর পর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিছু আহমদীরা নাটোরে ধীরে ধীরে হিজরত করে আসেন আর অল্পদিনেই নতুন বয়আতকারী আহমদীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

মসজিদ সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব

মসজিদের দোতলায় নামাজ পরাচ্ছেন মওলানা শরিফ আহমদ আফ্রাদ

যার ফলে নাটোরের তেবাড়ীয়াতে পূর্ণাঙ্গ জামাত কায়েম হয়ে গেল। এই নাটোর জামাতের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব।

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চৌধুরী বাড়ীতেই ছিলো নাটোর জামাতের মূল কেন্দ্র। চৌধুরী বাড়ীর যে ঘরটিতে বা-জামাত নামাজ ও জামাতী কার্যক্রম চলতো সেই ঘরটি এখন পর্যন্ত কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন স্থান থেকে আহমদীরা আজো এই ঘরটি দেখার জন্য আসেন। ঐ ঘরের কাছেই পারিবারিক কবরস্থানে এসব বুযুর্গগণ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। এরপর তেবাড়ীয়া হাটের পাশে জনাব রইস উদ্দিন সরকার সাহেবের বাড়ীতে বেশ কয়েক বছর বা-জামাত নামাজ আদায় ও তেবাড়ীয়া জামাতের কার্যক্রম চলতে থাকে। তখন তেবাড়ীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব রইস উদ্দিন সরকার সাহেব।

একই সাথে কৈগাড়ী কৃষ্ণপুরেও জামাতের কার্যক্রম চলছিল। তখন সদর মুরব্বী মহিবুল্লাহ্ সাহেব এবং মোয়াল্লেম জনাব আবু তাহের সাহেব কৈগাড়ী কৃষ্ণপুর কর্তব্যরত ছিলেন। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালের দিকে তেবাড়ীয়াতে সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) সফর করেন ও রাত্রি যাপন করেন। কয়েক বছরের মধ্যে আহমদীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায় তাই স্থান সংকুলানের বিষয়টি মাথায় রেখে ১৯৭৩ সালে মসজিদ তেবাড়ীয়াতে স্থানান্তরিত হয়।

রাস্তার পূর্বদিকে অবস্থিত এই মসজিদ স্থাপনের জন্য মোছা: রহিমা খাতুন সাহেবা স্বামী মরহুম ছহির উদ্দিন সাহেব ১১ শতাংশ জমি জামাতের নামে ওয়াকফ করেন আর মসজিদ তৈরীর জন্য মোছা: মোমেনা খানম সাহেবার দেয়া অর্থে ২০ হাত দৈর্ঘ্য মাটির দেয়াল ও টালির চালার ঘর তৈরী করা হয়। উক্ত মসজিদে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জামাতের কার্যক্রম চলে। তখন তেবাড়ীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব আব্দুস সালাম সাহেব। বর্তমানে উক্ত মসজিদের স্থানে জামাতের নিজস্ব কবরস্থান করা হয়েছে ।

ধীরে ধীরে এখানেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯৮৮ সালের দিকে ঐ মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে মরহুম ডা: আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব মসজিদ নির্মানের জন্য জমি দান করেন। তাঁর দেওয়া জমির উপরই ৬০ ফিট লম্বা ও ২৭ ফিট চওড়া মসজিদ তৈরী করা হয়।

বর্তমানে সেখানেই আরও জমি নিয়ে বড় আকারে দ্বিতল মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। বর্তমানে জামাতের সর্বমোট জমির পরিমাণ প্রায় ১ একর। পূর্বের চেয়ে জামাতের সদস্য সংখ্যা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ তেবাড়ীয়ার এই অংশটিকে স্থানীয়ভাবে অনেকে 'কাদিয়ান' পাড়া বলে।

১৯৯৯ সালে এই জামাতের সদস্যরা প্রবল মুখালেফাতের সম্মুখীন হন। এতে প্রায় ২৬ জন আহমদী সদস্য গুরুতর আহত হন। বিরোধিতার সময় সেখানকার আহমদীরা খুবই কঠিন ঈমানের পরীক্ষা দিয়েছেন।

এ কারণে এই জামাত অনেক উন্নতিও করেছে। তেবাড়ীয়া জামাতের বিরোধিতার বিস্তারীত রিপোর্ট পাক্ষিক আহমদীতে সে সময় প্রকাশ হয়েছে। জনাব আলহাজ্জ রেজাউল করিম সাহেবের ওয়াকফকৃত বাড়িটি মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবদের কোয়ার্টার হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

নাটোর তেবাড়ীয়া হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণেরও পদধূলিতে সিক্ত হয়েছে। যেমন ১৯৬২ সালের দিকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সাহাবী হযরত কুদরত উল্লাহ্ সানোয়ারী (রা.) নাটোর জামাত সফর করেন অন্যান্যদের মাঝে ১৯৬৩ সালের দিকে হযরত আবু আতা জলন্ধরী (রা.)-ও নাটোর জামাত সফর করেন তারপর হযরত চাঁন মোহাম্মদ সাহেবও তেবাড়ীয়া জামাত সফর করেন।

নাটোর তেবাড়ীয়া মসজিদের আশেপাশে বেশ কয়েকটি পরিবার একত্রে বসবাস করে। কয়েকটি বাড়ীতে সাক্ষাতের জন্য যাই, সবাই আপন মনে করে আমাদেকে সময় দেন। বড়ই আন্তরিকতার সাথে দুপুরের খাবার খাওয়ান জনাব জয়েন উদ্দিন প্রামানিক সাহেব।

তেবাড়ীয়া মসজিদ থেকে বিকালের দিকে ফিরে এসে চৌধুরী বাড়ীর যে ঘরটিতে প্রথম বা-জামাত নামায ও জামাতী কার্যক্রম চলতো সেখানে যাই। শেষে চৌধুরী বাড়ীর নিজস্ব কবরস্থানে গিয়ে সেই সব বুযর্গদের কবর জিয়ারত করি যাদের একনিষ্ঠ ত্যাগের ফলেই আজ নাটোর জেলায় আহমদীয়াতের সূচনা। রাতটা বোনের বাসায় কাটিয়ে সকাল ৭টার দিকে ট্রেনে করে নিজ বাড়ী পঞ্চগড়ের দিকে যাত্রা করি। দোয়া করি তেবাড়ীয়া জামাত আরো অনেক উন্নতি করুক আর এ মসজিদ যেন সবার জন্য শান্তি বয়ে নিয়ে আসে আর যারা এ মসজিদের কাজে শ্রম দিচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী
খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(সপ্তম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

....বলছিলাম বগুড়া জেলা স্কুলের তৎকালীন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং দক্ষ প্রধান শিক্ষক খান সাহেব মোবারক আলীর কথা। উল্লেখ্য যে, তিনি ছিলেন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোক এবং তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার আঞ্জুমান-ই আহমদীয়ার আমীর। শিক্ষা বিভাগে চাকুরী গ্রহণের আগে তিনি কাদিয়ানী মিশনারী হিসেবে দীর্ঘ দিন জার্মানীতে ধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি ছিলেন একজন ধর্মভীরু এবং উদার ও বিশ্বস্ত মানবপ্রেমিক। তাঁর ধর্ম বিশ্বাস যাই থাকুক না কেন তাতে করে তাঁর কোন প্রভাব তৎকালীন স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রের উপর পড়েনি। তিনি মনে করতেন যে প্রত্যেক জেলায় মাত্র দুইজন করে ফার্স্ট ক্লাস সরকারি কর্মচারী রয়েছেন তার মধ্যে একজন হলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্য জন জেলা স্কুলের হেডমাস্টার। এই অভিজাতাবোধ তাঁর কথা বার্তায় চলন ফেরনে এবং আচার-আচরণে প্রকাশ পেত। হেডমাস্টার হিসেবে তাঁর সুনাম এবং অবস্থান কতটা দৃঢ় ছিল তা বোঝা যাবে নিচের একটা ঘটনা থেকে।

একদিন স্কুলের নবম শ্রেণীর এক ছাত্র তার হাতের সোনা আংটি হারিয়ে ফেলল। ক্লাসের ডেস্ক এর উপরে যে কালির দোয়াত বসানো থাকে তার মধ্যে সে হাতের আংটি খুলে রেখে দেয় এবং পরবর্তী সময়ে কে বা কারা ঐ আংটি চুরি করে নেয়। তখন এক ভরি সোনার দাম ছিল মাত্র ২৫ টাকা। আংটি হারানোর খবর হেডমাস্টারের কাছে পৌঁছা মাত্র তিনি ছাত্রদের এ্যাসেম্বলী কল করলেন। ছাত্ররা মাঠে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ালো এবং শিক্ষকরাও দাঁড়িয়ে পড়লেন। হেডমাস্টার খান সাহেব মোবারক আলী বলিষ্ঠ পদক্ষেপে মাথা উঁচু করে ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন যে নবম শ্রেণী থেকে একটি ছাত্রের আংটি চুরি গেছে, আমার ধারণা যে এই আংটিটি বাইরের কেউ চুরি করেনি। ছাত্রদের মধ্যে থেকেই কেউ চুরি করেছে।

আমি হেড মাস্টার তোমাদের বলছি যে, আজ স্কুল ছুটি হবার আগেই এই আংটিটি সহকারী প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে। যদি চোর এই আংটি ফেরত না দেয় তাহলে কাল থেকে আমি স্কুলে আসবো না। কারণ যে স্কুলে চোর ছাত্র আছে সে স্কুলে খান সাহেব মোবারক আলী হেডমাস্টারী করে না। এই কথা এমন ভাবে উপস্থিত ছাত্রদের প্রভাবিত করল যে সেই দিনই স্কুল ছুটি হবার আগে চুরি যাওয়া আংটি সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা হল। ছাত্ররা মনে করেছিল যে যদি আংটি ফেরত না হয় এবং কাল থেকে যদি হেডমাস্টার স্কুলে না আসে তাহলে ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হবে। তাই স্কুলের ক্ষতি রোধ করতে যে ছেলেটি আংটি নিয়েছিল সে সেটা ফেরত দিল। পরের দিন স্কুল বসার আগে হেডমাস্টার এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের সততা এবং তাঁর কথা শোনার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যে ছেলেটি আংটিটি সরিয়ে ছিল তাকে কাছে ডেকে তার নৈতিক সাহস ও সত্যবাদিতার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং সবার সামনে তার হাতে একটি ১০ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে পুরস্কৃত করেন। আজকের দিনে এ জাতীয় ঘটনা কল্পনা করা যায় কি? যায় না। কারণ সমাজ বদলে গেছে এবং চোরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

....হাসি কান্না দোল দোলানো পৌষ ফাল্গুনের পালা-তারই মধ্যে বগুড়া জেলা স্কুলের আমাদের ছাত্র জীবনের পাঁচ ছয় বৎসর কেটে যায়। এই সময়ের মধ্যে আমাদের শিক্ষকেরা আমাদের পড়িয়েছেন, ভালোবেসেছেন, আদর করেছেন এবং শাস্তিও দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ মানুষ হতে যা কিছু করতে প্রয়োজন তা সবই করেছেন। আবৃত্তি, নাটক, সংগীত, বয়েজ স্কাউট, কাবইং ইত্যাদির কথা বলাই বাহুল্য। খেলাধূলার দিক দিয়েও বগুড়া জেলা স্কুল চ্যাম্পিয়ন ছিল। আজ প্রায় ৭০ বছর পরে স্মৃতির অলিন্দে যা কিছু নজরে আসছে সবই আমাদের জীবনকে কুসুমাস্তীর্ণ করার জন্য বগুড়া জেলা স্কুলের অবদান।

বগুড়া জেলা স্কুলের দেড়শতবর্ষ (১৮৫৩-২০০৩) পূর্তি উপলক্ষ্যে জয়ন্তী উৎসব জাঁকজমক ও বর্ণাঢ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। ২৭-২৮ জানুয়ারি

২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত এই মহতী অনুষ্ঠান প্রবীন নবীন ছাত্র শিক্ষকের উপস্থিতিতে সরগম হয়ে উঠেছিল। প্রাণের মিলন মেলায় পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠাতার শুরু থেকে ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে যারা দেশে ও বিদেশে বরণ্য হয়েছেন এবং স্কুলে বিশেষ অবদান রাখেন সেই গুণীজনের মধ্যে ক'জনকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। তাদের মধ্যে খান সাহেব মোবারক আলীকে শিক্ষকতায় বিশেষ অবদানের জন্য মরনত্তোর সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। বন্ধন '৭৯ নামের ব্যাচ এই সংবর্ধনার আয়োজন ও ক্রেষ্ট প্রদান করেন। ফলে বর্তমান প্রজন্মের নিকট খান সাহেব মোবারক আলীর নামটি উজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্বরীত হয়ে উঠেছে। বগুড়াবাসী তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং অনাগত দিনেও তাঁর নাম বগুড়ার জনপদে কিংবদন্তি হয়ে থাকবে।

কাদিয়ান প্রেম

কোলকাতা মাদ্রাসা লাইব্রেরিতে Review of Religions পত্রিকা পাঠে আহমদীয়া জামা'ত এবং কাদিয়ানের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ সৃষ্টি হয় তা ক্রমবর্ধমান ধারায় আজীবন তাঁর মাঝে পরিস্ফুটিত ছিল। সেজন্য তিনি ১৯০৯ সালে বিভিন্ন জনের নিকট থেকে পথের সন্ধান লাভে দুর্গমগীরি পাড় হয়ে অচেনা-অজানা এক গ্রাম কাদিয়ান চলে যান। আল্লাহ্ তাআলার নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টির রহস্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন। মাসখানেক কাদিয়ানে অবস্থান করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)সহ জামাতের বিশিষ্ট সাহাবীদের সান্নিধ্যে নূরের পরশ লাভ করেন। ফলে বয়আত করে তিনি কাদিয়ানের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত দারুল আমান এবং কাদিয়ানের আলো বাতাস তাঁকে বিমোহিত করে তোলে। পবিত্র কুরআন হাদীস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞান আহরনে উত্তম তবলীগ সৈনিকে পরিনত হবার অনুপ্রেরণা জন্মে। তাই এ যুগের ধর্মীয় জ্ঞান লাভের উত্তম পাঠশালা কাদিয়ানে শিক্ষা লাভে নিয়োজিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিকট হৃদয়ের আকুতি ব্যক্ত করে আরজ করেন–'হুযূর আমি বয়আত করলাম বটে। কিন্তু কুরআনের জ্ঞান লাভ করে ইসলাম সম্বন্ধে ভাল জানা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কারণ আমি ভাল আরবী জানি না। আরবী ভাষার জ্ঞানাজ্ঞনে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। তাই কুরআনের মাঝে কি আছে তা আমাকে মোটামুটি সংক্ষেপে বলে দিন। তাহলেই আমার জন্য যথেষ্ট হবে'। উত্তরে হুযূর (রা.) বলেন–মোবারক আলী। তুমি ভয় করিও না। তোমার কুরআন শিক্ষার এমন বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, যাতে আরবী ভাষা শিক্ষা হবে এবং কালামুল্লাহ্ শিখতে পারবে। এই কিতাব আল্লাহ্ তাআলার বাণী। এটা শুধু পন্ডিতদের জন্য নয়, সর্বসাধারণের জন্য। এ কিতাবের ভাষা খুব প্রাঞ্জল। প্রথম ক'টি সূরার অর্থ শিখলে অন্য সূরাগুলির অর্থ শিক্ষা করা অনেক সহজ হবে'।

তখন হুযূর আউয়াল (রা.) মওলানা সূফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব বি-এ কে তাঁর কুরআন শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য, সূফি সাহেব মৌলভী ফাজেল ও আরবী ভাষায় সুপন্ডিত এবং হাই স্কুলের হেড মৌলভী ছিলেন। কাদিয়ানে সালানা জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি প্রায়ই কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি পরে মরিশাস দ্বীপে আহমদীয়া জামাতের মিশনারী হিসেবে সুদীর্ঘ ১২ বছর কাজ করেছেন। তাঁর কুরআন তেলাওয়াত খুব সুমধুর ছিল। ফলে পবিত্র কুরআনের উপর এমন জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকট থেকে মোবারক আলীর শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য হয়। মরিশাস দ্বীপের প্রথম মিশনারীর আদর্শগত শিক্ষার আলোকে জার্মানীর প্রথম মিশনারীর সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ্ ছাড়া কেহ জানেন না বাংলা মায়ের সোনার সন্তান মোবারক আলী একদিন লন্ডনের মিশনারী হবেন এবং জার্মানীর প্রথম মিশনারী হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন–অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁরই নিকট, তিনি ছাড়া তা কেউ জানেন না এবং জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন (আল্ আনআম : ৬০)।

তখন তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত তরজমাসহ কাদিয়ানের বিশিষ্ট সাহাবী ও আলেম হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ (রা.), হযরত মওলানা শের আলী (রা.), হযরত মৌলভী মোহাম্মদ আলী (রা.) এবং হযরত ডঃ মোহাম্মদ সাদেক (রা.) প্রমুখের সংস্পর্শ লাভে ধর্মীয় জ্ঞান আহরনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। জামাতের খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)সহ জামাতের বিশিষ্ট সাহাবীদের অতি স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। বাংলা থেকে আগত যেন কাদিয়ানের সন্তান হিসেবে পরিণত হন।

এমতাবস্থায় উচ্চপদস্থ এক সরকারি চাকুরির ইন্টারভিউতে অংশ গ্রহণে বগুড়া চলে আসার জন্য মোক্তার চাচা টেলিগ্রাম করেন। আসার সুবিধার্থে যাতায়াত খরচ বাবদ মানি অর্ডার যোগে প্রয়োজনীয় অর্থও প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাঁর পরও কাদিয়ান প্রেমিক মোবারক আলীর মন চায় না পুণ্যভূমি কাদিয়ান ছেড়ে চলে আসতে। পার্থিব জীবনের প্রতিথযশা উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরী তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। তবুও ভাবেন মোক্তার চাচা পিতৃতুল্য স্নেহ করেন এবং তাঁর স্নেহস্পর্শে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছেন। কাজেই বিষয়টি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিকট পেশ করা প্রয়োজন। তাই এর সিদ্ধান্তের জন্য হুযূর (রা.)-এর নিকট উপস্থাপন করেন। তখন হুযূর (রা.) বলেন–'যেহেতু আপনার সরকারি চাকুরির বিষয় এবং অভিভাবকরা চাচ্ছেন তাই চলে যান'। মোবারক আলী বলেন–'হযূর আমার মন চাই না কাদিয়ান ছেড়ে যেতে, তবু আপনার নির্দেশ পালনে যাচ্ছি, তবে শীঘ্র ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ্'। অত:পর বন্ধু উকিলউদ্দিন খন্দকারসহ চলে আসেন।

তবে তিনি শারীরিকভাবে মাতৃভূমিতে চলে আসলেও তাঁর মনপ্রাণ পরে থাকে কাদিয়ানের পুণ্যভূমিতে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত দারুল আমানে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং জামাতের বিশিষ্ট সাহাবীদের প্রত্যক্ষ স্নেহস্পর্শ ও দোয়া থেকে বঞ্চিত থাকা তাঁকে পীড়া দেয়। তাই ১৯১০ সালে বি টি বর্তমান বি এড কলেজে অধ্যয়ন কালে কলেজ পূজার বন্ধ হলে বন্ধুবর রাজশাহী কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ আতাউর রহমানসহ পুণরায় কাদিয়ান চলে যান। জামাতী তালিম তরবিয়ত লাভে নিয়োজিত হন। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্

আউয়াল (রা.) ঐশী নির্দেশে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৩ অক্টোবর ১৯১০ তারিখ বৃহস্পতিবার বাদ ফজর তাঁর বৈঠকখানায় ১২ জন খোদাপ্রেমিক খাদেমের উপস্থিতিতে এক ভ্রাতৃ সংঘ (Brother Hood) গঠন করেছিলেন। সেই সংঘে আমাদের বাঙালি রত্ন মোবারক আলীর সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য হয়। এ সংঘের ভাগ্যবান ব্যক্তিরা হলেন–

(১) হযরত মওলানা চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ স্যায়ল (রা.)। তিনি লন্ডনের মিশনারী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম ধর্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার জন্য আহ্বান করলে চৌধুরী ফতেহ সাহেব নিজেকে সোপর্দ করেন এবং বহির্বিশ্বে প্রথম মিশনারী হিসেবে লন্ডন যান। লন্ডনের ৬৩নং মেলরোজ রোডে এক একর জমি ক্রয় করে জামাতের প্রথম তিন তলা কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ তাঁর হাতে সম্পাদিত হয়।

(২) মোহাম্মদ আতাউর রহমান। তিনি কোলকতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ, পাশ করে রাজশাহী কলেজে শিক্ষকতা করেন। আহমদী হিসেবে তিনি প্রথম মোবারক আলীকে তবলীগ করেছেন এবং কাদিয়ান যাবার পথের সন্ধান দেন। পরে তিনি আসামে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ পদে চাকুরি করেছেন। আসামী ভাষায় পবিত্র কুরআন শরীফ অনুবাদ করেন।

(৩) জনাব ফকির উল্লাহ্। তিনি বি এ বি টি পাশ করে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পদে চাকুরি করেছেন;

(৪) হযরত মৌলভী মোহাম্মদ দীন (রা.)। তিনি কাদিয়ান টি আই হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আমেরিকার দ্বিতীয় মিশনারী হিসেবে তিনি ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। পরবর্তীতে রাবওয়ার নাজেরে দাওয়াত ও তবলীগ পদে কাজ করেন।

(৫) মিঞা আব্দুল হাই। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) এর প্রথম পুত্র। তখন তাঁর বয়স ১২/১৩ বছর। হাই স্কুলের ছাত্র। তিনি ১৮ বছর বয়সে অকালে মারা যান।

(৬) মৌলভী আব্দুল মুগনী খাঁ। তিনি তখন আগরা কলেজের বি এস সি ছাত্র ছিলেন। পরে কলেজ ছেড়ে কাদিয়ান টি আই স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং আজীবন বিভিন্ন পদে জামাতের খেদমত করেছেন।

(৭) খান সাহেব মৌলভী ফরজন্দ আলী। তিনি সৈনিক বিভাগে চাকুরি করতেন। লন্ডন মিশনেও কাজ করেছেন। আজীবন জামাতের খেদমত করেন।

(৮) জনাব আহমদ নূর পাঠান। তিনি আফগানিস্তানের সাহেবযাদা হযরত মওলানা আব্দুল লতিফ (রা.)-এর শিষ্য ছিলেন। আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদ হওয়ার পর কাদিয়ান চলে আসেন এবং বাকী জীবন কাদিয়ানে জামাতের খেদমতের মাঝে অতিবাহিত করেন।

(৯) মৌলভী গোলাম রসূল পাঠান। তিনি আফগানিস্থানের সাহেবযাদা হযরত মওলানা আব্দুল লতিফ (রা.)-এর শিষ্য ছিলেন। আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদ হওয়ার পর কাদিয়ানে হিজরত করেন।

(১০) জনাব শেখ তাইমুর। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বন্ধুপুত্র ছিলেন। ছেলে বেলায় পিতৃ বিয়োগ হলে হুযূর (রা.) তাকে প্রতিপালন করেন এবং উচ্চ শিক্ষায় এম এ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। হুযূর (রা.) ওফাতের পর তিনি আহমদীয়া জামাত ত্যাগ করেন।

(১১) মৌলভী আব্দুর রহমান। তিনি টি আই হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। Review of Religions পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি যুবক বয়সে মারা যান এবং

(১২) খান সাহেব মোবারক আলী। এই বইয়ের আলোচ্য ব্যক্তি।

এই ভ্রাতৃসংঘ গঠনের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন–'আজকের দিন বিশেষ দিন এবং এই সময় একটি বিশেষ সময়। আমি আমার খেয়াল মত নয় বরং বিশেষ অনুপ্রেরণা পেয়েই এটা করছি। এর ফল কি দাঁড়াবে জানি না। বটের ছোট বীজ এবং প্রকান্ড বটবৃক্ষের মধ্যে যেমন অনেক তফাৎ তেমনি আজকের এই ক্ষুদ্র সংঘ হয়তো একদিন অনেক বড় হবে। .....তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন কর্মস্থলে চলে যাও এবং অধ্যয়ন, ব্যবসা বা চাকুরি যে যা করছ তা-ই করতে থাকো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এই বিধির উপর তোমাদের সর্ব কর্ম গড়ে উঠুক। তোমরা মানবজাতির মধ্যে ধর্মকে প্রচার কর। কলেমাকে বাড়ালে আযান হয় এবং আযানকে বাড়ালে নামায হয়। কুরআন ধর্মের সকল সত্যের উৎস। তোমরা সমগ্র কুরআন মজীদকে বার ভাগে ভাগ করে এক এক জন এক এক অংশ মুখস্ত কর। ফলে প্রত্যেকের কুরআন পাঠের সমষ্টিতে পূর্ণ কুরআন গ্রন্থ মুখস্ত হয়ে যাবে। তোমরা বার ভাই পরস্পরের সাথে বিশেষ পরিচিত হবে। দূর দেশে থাকলেও পরস্পরের মধ্যে পত্রালাপে বা অন্য কোন উপায়ে যোগাযোগ রাখবে। তোমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হবে ইসলামের প্রচার করা (পাক্ষিক আহমদী ১৫-৩১ আগষ্ট ১৯৬৫)।

(চলবে)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ব্রত:

"ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে"

"Love for all
Hatred for none"

আমাদের ভেবে দেখা দরকার

সংকলকঃ **খালিদ আহমদ সিরাজী**

১। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, ব্যভিচার বৈধ নয়, গোপন বন্ধুত্বও বৈধ নয়- (সূরা মায়েদা-৬ আয়াত)

২। অন্ধ ব্যক্তির সামনেও পর্দা করার আদেশ ইসলামে রয়েছে (আবু দাউদ)

৩। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিষেধ করেছেন যেখানে বেগানা নারীদের মধ্যে মেলামেশার অবাধ সুযোগ ঘটে এবং তারা বেপরোয়া ভাবে একত্রে ভ্রমণ করতে পারে, সেখানে প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অনায়াসে তাদের পদস্খলন ঘটবে..... (মালফুযাত-১ম খন্ড)।

৪। পর্দার উদ্দেশ্য হলো নারী পুরুষ উভয়ে তাদের পরস্পরের সাথে অবাধ মেলামেশা ও পরস্পরের সৌন্দর্যের আকর্ষণ হতে বিরত থাকা, কেননা এতে নারী পুরুষ উভয়ের মঙ্গল রয়েছে। (ইসলামী নীতি দর্শন, বাংলা সংস্করণ পৃঃ ৪৮-৪৯)

৫। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন "সেই সব খান্দানের উপর লা'নত, যারা মেয়েদের দিয়ে রোজগার করায় (বিবাহ ও জীবন পৃঃ ৯১)।

৬। কোন মেয়ে মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে বিদেশ যাত্রা করবে না (বুখারী, মুসলিম)।

৭। মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, আমি এ ক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকরি করতে পারেন কিন্তু তাও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবে পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না (২৫/১১/০৯ ইং পত্র নং- জি.এস/আমুজাবা/৭১৮)।

৮। অভাবগ্রস্থ লোককে সাহায্য করা কোন অনুগ্রহ নয়, নৈতিক দায়িত্ব পালন করা মাত্র।

৯। কোন ব্যক্তিকে কিছু দান করে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছ এরূপ মনে করো না। বরং সে যে তোমার দান গ্রহণ করেছে সেজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

১০। যারা ওয়াজ মাহফিল করার সময় মানুষের তারিফ প্রত্যাশা করে, সেই সমস্ত তোশামোদপ্রিয় লোকের অন্তর সাধারণত আল্লাহ্‌র ভয় হতে শূন্য থাকে। এই শ্রেণীর গাফলতি এমন এক মারাত্মক অভিশাপ, যা বান্দাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হতে দূরে নিক্ষেপ করে।

১১। হিংসুক যা কিছু করে, যেহেতু সে হিংসার আগুনে জ্বলে তা করে, তাই বিবেকের মাথায় আগুন লাগিয়ে সে তা করতে থাকে। ফলে সেই আগুনে নিজে নিজেই সে ভস্ম হয়ে যায়।

১২। প্রত্যেক শত্রুতার অবসান সম্ভব, একমাত্র সেই শত্রুতা ছাড়া, হিংসা হতে যার জন্ম।

১৩। অমনোযোগিতা সহকারে যে কাজ অনুষ্ঠিত হয় তা নিতান্ত তুচ্ছ এবং অপদার্থ। কেননা, হৃদয়ের সঙ্গে সেরূপ কাজের কোন সম্পর্কই থাকে না।

১৪। **কুল্লু আরহামাকুম ওয়া লাও বিস সালাম,** অর্থাৎ নিজ আত্মীয়তার সম্পর্ক সজীব রেখো (যদি কিছু করতে না-ই-পারো তবে সালাম দ্বারা হলেও)।

১৫। আল্লাহ্‌ কেবল সেই সকল লোকের তওবা গ্রহণ করেন যারা অজ্ঞতা বশতঃ মন্দকর্ম করে, অতঃপর সত্বরই তওবা করে। এদের প্রতিই আল্লাহ্‌ সদয় দৃষ্টিপাত করেন বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময় (৪:১৮)।

১৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন "মু'মিন যখন কোন গুনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যদি সে তওবা করে ও ক্ষমা চায়, তার অন্তর সাফ হয়ে যায়, আর যদি গুনাহ বেশী হয় দাগও বেশি হয়। অবশেষে তা তার অন্তরের উপর ছেয়ে যায়, এটাই সেই মরিচা যার উলেখ আল্লাহ্‌ তাআলা আপন কালামে বলেছেন, কখনই না বরং তাদের অন্তরে মরিচা স্বরূপ লেগেছে যা তারা বরাবর উপার্জন করেছে (সূরা মুতাফফেফীন- আহমদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ)।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নিজেদের জীবনকে ইসলামী নিয়ম মাফিক গড়ে তোলার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

Satellite: Asiasat 3S
105.5° East, Frequency 3760 MHz
Symbol Rate: 26000
Polarization: Horizontal

আরো জানার জন্য লগ ইন করুনঃ **www.mta.tv**

কবিতা–

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় যুগল শহীদ স্মরণে

এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি তোমার নামেতে স্মরি
সকলে মোরা মিলিয়া মিশিয়া তোমার গুণগান করি।
হে রহিম রহমান তোমারই ইবাদত মোদের জীবন বারি
তোমার নামে বেঁচে আছি মোরা তোমারই তরে যেন মরি।
১৯৬৩ ইংরেজী সনের তেসরা নভেম্বর
ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সালানা জলসা ট্যাংকের দক্ষিণ পাড়।
৪৭তম সালানা জলসা সেজেছে নবরূপ সাজে
খোদ্দাম আর আনসারগণে ভীষণ ব্যস্ত কাজে।
বিশাল ময়দান সারাটা জুড়িয়া টাংগানো সামিয়ানা
হাসি-খুশী ভরা শত শত লোক করছিল আনাগোনা।
দেখিতে দেখিতে লোকজন এসে ভরে গেল ময়দান
আসমান হতে ফিরিশ্‌তা কুলে গাইছিল জয় গান।
ময়দানে লোক, রাস্তায় লোক, দোকানে লোকের সারি
ছাদে আছে লোক বারান্দায় লোক শুনিতেছি বাড়ী বাড়ী।
পিন পতনের নেইকো শব্দ কোথাও একটু খানি
বক্তা হিসাবে তৌফিক চৌধুরী ছিলেন এতই মানি।
তেজোময় কণ্ঠ প্রখর যুক্তি, দলিল প্রমাণে ঠিক
এসো ভাই সবে মাহ্‌দীর পথে এসো সত্যের দিক।
ইবলিস দলে হিংসায় মরে দিশাহারা পাগল প্রায়
এবার বুঝি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার লোক সবে আহমদী হয়ে যায়।
তাজুল বাহিনী হুংকার ছাড়ে হিংস্র হায়েনার মতো
'জগত বাজার'-এর মাহফিল থেকে ওরা ছুটে আসে শত শত।
হাতে লাঠিসোটা ইট-পাটকেল দেশীয় অস্ত্র সাজে
জাহেলের দল শুরু করে দিল জাহেলীপনার কাজে।
মানবতা নেই কোন খানে আজ রক্ত নেশায় ঘোর
খুনের নেশায় মত্ত ওরা এদিক সেদিক দেয় দৌড়।
উত্তর হতেও এজিদের দলে সভাতে করিল হানা
এরূপ কিয়ামত রচনা করিবে কারো ছিল নাকো জানা।
চিৎকার রবে রক্তমাখা হিংস্র হায়েনার দল
বিভৎস সব আওয়াজ করে হাসছিল খল খল।
মজলুমের উপর চড়াও হলো সাজোয়া জাহেলী দল
আঘাত হানিল প্রচন্ড ভাবে তাদের যত ছিল বল।
মুজলুমগণে আঘাতে আঘাতে হয়ে যায় পেরেশান
আঘাতের চোটে কারো কারো অবস্থা এই বুঝি গেল জান।
কারো হাতে পায়ে কারো মাথা গায় আঘাতের চোটে কাটা
কারো নাক মুখ, কারো পিঠ বুক, কারো বা মাথা ফাঁটা।
পাথর মেরে আঘাত করেছে তায়েফের ছোকড়ার মতো
ইট-পাথরের কঠিন আঘাতে আহত হল শত শত।
ওহে আল্লাহ্‌! কি বলিব আর এ কোন আলামত
জাহেলী নমরূদের দলে করিল একি কিয়ামত?
রক্তের স্রোতে ভিজেছে ময়দান আর ময়দানের ঘাস
এতিমের মতো বালক-বালিকা বলে একোন সর্বনাশ।
চিৎকার আর শোরগোল যেন-এতিম বাচ্চার ডাক
মাঝে মধ্যে শোনা যায় তখনও হিংস্র হায়েনার হাঁক।
আকাশ বাতাস চিৎকার করে বিজলী ফাঁটিয়ে দিল সাড়া
জগতের বুকে এখনও আছে এত হীন কাজ করে তারা।
হাশরের ময়দান হয়ে গেছে হেথা
কে বুঝিবে বল কার কত ব্যাথা?
সকলে আহত আর রক্তাক্ত দেখিবার কেহ নাই
প্রত্যেকে শুধু কঠিন ব্যাথায় করে শুধু হায় হায়।
ওসমান ভাইকে লাঠির আঘাতে মাটিতে ফেলে তারা
পাষানেরা দাঁড়িয়ে তারই শিয়রে দেখে গেছে নাকি মারা?
বেহুস মাটিতে দম যায় বুঝি দেখিবার কেহ নাই।
মাঠের কোণে গাছের তলায় শহীদীর স্বাদ পায়।
বজ্রনিনাদে গর্জে উঠে আকাশ-বাতাস দিল সাড়া।
হায়! হায়! হায়! এত বড় সর্বনাশ,–আজ করিল কারা?
ওহে আল্লাহ্‌! কি বলিব আর সইতে পারি না জ্বালা
কি দিয়ে আমি গেঁথে যাব হায় শহীদের শোক মালা।
মৌলবী মোহাম্মদের নির্দেশ এলো রুগীদের করো সেবা
যত তাড়াতারি রুগীদের সব হাসপাতালেতে নিবা।
ফরিদ বাহিনীর খোদ্দামগণে রোগীদের নিয়ে ছুটে
সেবাদান তরে আনসারগণ আর লাজনা বোনেরা জোটে।
ডাক্তারের ক্লিনিক আর হাসপাতালে রুগী সব গেল নিয়ে
কত ভাই-বোন সওয়াব নিল নিজের রক্ত দিয়ে।
হাসপাতাল মেঝেতে রুগী সব ফেলি
ডাক্তার দেখে কোথা সিট খালি।
রুগীর রক্তে হাসপাতাল বারান্দা হয়ে যায় লালে লাল
এ অবস্থা দেখে সিভিল সার্জন হয়ে যায় বে সামাল।
ছটফট করে সারারাত কাটে হাসপাতাল বিছানায়
পরদিন সকালে আব্দুর রহিম ভাই শহীদের স্বাদ পায়।
অশ্রু সজল করুন নয়নে আহমদী ভাইগণ
খবর পেয়ে হাসপাতাল পানে ছুটে আসে হন হন।
ওসমান ভাইয়ের শহীদের পরে শহীদ হল রহীম ভাই
খবর শুনিয়া তারুয়াবাসীরা বলে উঠে হায় হায়!
খবর পড়িল আঞ্জুমানে খবর রাবওয়া মরকজ পানে
যুগল শহীদ হয়েছে ও ভাই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে।
কি বলিব ভাই মনে বড় ব্যাথা সইতে পারি না আজি
যারা আহত হয়ে বেঁচে রইল তারাও হলো গাজি।
আর আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত তারা নয়তো মৃত
সদা সর্বদা খোদার মাজারে তারা থাকে জীবিত।
ওসমান ভাই খোদ্দাম জোয়ান তেজোময় সৈনিক
ঈমানী বলে দৃঢ়তার সাথে বাড়ছিল দৈনিক।
আব্দুর রহিম ভাই হয়েছে চাঁদবদনী মুখ
হাঁসি মুখ খানা কভু যেন জীবনে ছিল না কোন দুঃখ।
নিজেদের দৃষ্টান্ত নিজেরাই যেন কেহ নাই তার জুড়ি
আমরা কেহ কভু তাঁর পুণ্যপথ ডিংগাতে না পারি।
মহান আল্লাহ্‌ কবুল করিল তাইতো চলিয়া গেল।
যুগল শহীদের জীবন কাহিনী হোক মোদের জীবন বারি
শহীদী আত্মা দিয়ে মোরা সবে নিজেদের জীবন গড়ি।
ওহে আল্লাহ্‌ করুণা করো শহীদ যুগলের তরে
আহমদীয়াতকে পৌঁছে দাও তুমি বাংলার ঘরে ঘরে।
সকল শহীদদের সালাম জানাই, সালাম ও মোবারকবাদ
যুগল শহীদ লওহো-সালাম আর সকলকে ধন্যবাদ ॥

সংবাদ

সোহাগী হালকায় মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে একটি সীরাতুন নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়

গত ২৬ তারিখ রোজ শনিবার সোহাগী হালকায় মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে একটি সীরাতুন নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত জলসার কার্যক্রম চলতে থাকে। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারি। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মঞ্জুরুল আলম। নযম পাঠ করেন জনাব তোফাজ্জেল হোসেন। সীরাতুন নবীর উপর আলোচনা পেশ করেন যথাক্রমে, মৌ. এস. এম. আবু তাহের, মওলানা জাফর আহমদ ও মওলানা রবিউল ইসলাম। এতে ৩০ জন আহমদী ও ১৭০ জন মেহমান সহ সর্বমোট উপস্থিত ছিলেন ২০০ জন। এই জলসায় বয়আত গ্রহণ করেন ২০ জন, আলহামদুলিল্লাহ।

এস, এম, আবু তাহের

চরসিন্দুর জামাতে সীরাতুন নবী জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চরসিন্দুরের উদ্যোগে গত ১১ ডিসেম্বর ২০০১১ 'মসজিদুল মাহদী'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার হোসেন-এর সভাপতিত্বে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলোওয়াত করেন তানভীর আহমদ, নযম পাঠ করেন ইমরান আহমদ, তাহের আহমদ (প্রান্ত) এবং কৌশিকুজ্জামান (অমি)। এরপর আহমদীয়া জামাতের দৃষ্টিতে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সান ও মর্যাদা, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের পূর্ববর্তী জীবন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মান্যকারীদের উপর অত্যাচার এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা বিষয়ের উপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মৌ. আবুল কাসেম আনসারী এবং মৌ এস, এম, মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। সবশেষে দোয়া এবং আপ্যায়নের মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সমাপ্তি হয়। উক্ত জলসায় ৩২ জন আহমদী, ১৭ জন অ-আহমদী মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ নারায়ণগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/১১/২০১১ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ ঘটিকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়, (আলহামদুলিল্লাহ্‌)। স্থানীয় মজলিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহতরমা আবেদা চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে জলসার কাজ শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন শাহানা বাশার এবং নযম পাঠ করেন সুরাইয়া নাসের তুলি ও খাওলাদীন উপমা। অত:পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন চরিত্র সম্পর্কে ফারহান চৌধুরী, খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে সুফিয়া বেগম, ইসলাম প্রচারে বিশ্বনবী (সা.) এর আদর্শ সম্পর্কে ফারহানা আক্তার, বিদায় হজ্জের ভাষণ সম্পর্কে সুফিয়া বেগম বক্তব্য রাখেন। সভানেত্রীর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে বক্তৃতা পর্ব শেষ হয়।

উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় ৩৬ জন লাজনা ও ১৭ জন নাসেরাত এবং কয়েকজন মেহমান উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে আপ্যায়নের মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ খুলনার কর্মশালা

গত ০৬/১০/২০১১ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ খুলনার নতুন অফিস কক্ষে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ খুলনার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, খুলনা। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন দীনা নাসরিন, মুফাত্তিস, খুলনা অঞ্চল। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তাহেরা মাজেদ রাফা। দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালা শুরু হয়। কর্মশালায় বিভিন্ন সেক্রেটারীগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত কর্মশালায় মোট ১৮ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর

বিজ্ঞপ্তি
তালিম দপ্তর থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

তালিম দপ্তর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছরে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১১ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় পুরস্কার প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামাতে আমীর/পেসিডেন্ট/মুরব্বী/ মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার সন্তান যদি এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১২ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে না।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালীম

ফতুল্লায় তবলীগ ও তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬/১০/১১ তারিখ বাদ মাগরিব ফতুল্লা পিলকুনিতে জনাব ফরিদ উদ্দিনের বাসায় ১টি তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জনাব আবুল হাসেম বিপি প্রেসিডেন্ট ফতুল্লা সভাপতিত্ব করেন। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফরিদ উদ্দিন, হাদীস পাঠ করেন জনাব কাজী মোবাশ্বের আহমদ, জুবিলী দোয়া পাঠ করেন জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমদ, তরবিয়তী বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব সামসুদ্দিন আহমদ ও মৌ. আমীর হোসেন। সভাপতির ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ১৯ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৭/১০/১১ তারিখ বাদ আসর সস্তাপুর জনাব ফরিদ আহমদ-এর বাসায় দরসে কুরআন ও আল ওসীয়্যত' পুস্তকের উপর আলোচনা করা হয়। মাগারিবের পূর্ব পর্যন্ত কুরআনের দরস চলে। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়। খাকসার কুরআন দরস দেই এবং তবলীগ বিষয়ে আলোকপাত করি। বাদ মাগরিব আল ওসীয়্যত পুস্তকের উপর সর্বপ্রথম আলোচনা করেন জনাব কাজী মোবাশ্বের আহমদ ও মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন। পরে সভাপতি দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

গত ৬ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ মঙ্গলবার বাদ মাগরীব হতে রাত ৮-৩০ মি: পর্যন্ত প্রায় ৩ ঘন্টা সস্তাপুর জনাব ফরিদ আহমদ-এর বাসায় ১টি তবলীগি প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এতে সভাপতিত্ব করেন। জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমদ কুরআন তেলাওয়াত করেন। এরপর আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি তুলে ধরেন মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের ও মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন: "আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

পাক্ষিক আহমদী আমার আপনার সবার প্রাণের পত্রিকা।
তাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করুন।
গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন। এর মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :
ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা
গাজী গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 11th Issue

The Ahmadi Fortnightly

15 December, 2011 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com